প্রকাশিকা :
তাপসী সেনগুপ্ত
কসমো ক্রীপ্ট্
১১, নিতাই বাবু লেন,
কলকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীসাধন কুমার গুপ্ত
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রিন্টিং
২১বি, রাধানাথ বোস লেন,
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
সন্তোষ গুপ্ত

দাম : দশ টাকা

যা চলে যায় তাই আমাদের বড় প্রিয়। সময়, ঘটনা, চরিত্র, জীবন, যৌবন। বর্তমানের ওপারে মজার সংসার পেতে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা এখান থেকে কেউ হেসে গেছেন, কেউ কেঁদে গেছেন। কারুর স্মৃতি এখানে পড়ে আছে, কেউ একেবারে মুছে গেছেন।

অতীত যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা মন-কেমন করা সানাইয়ের সুর। ছিল আজ আর নেই। সেই হারান স্মৃতির পাতা খুলে খুলে………

তাপসী সেনগুপ্ত

স্নেহভাজনেষু

কাল উনবিংশ শতাব্দীতে পা রেখেছে। কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো। বাবুদের বাড়িতে বাড়িতে ঝাড়লণ্ঠন। অন্ধকার অন্ধকার রাস্তায় ফিটন। ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ। শবযাত্রীদের হরিধ্বনি। জলসাঘর থেকে উপচে পড়া বাইজীর ঘুঙুরের শব্দ। আতর, বেলফুলের গন্ধ। হুগলী নদী থেকে ভেসে আসা ক্লান্ত স্টিমারের মধ্যরাতের ঘরে ফেরার গম্ভীর ভোঁ। গঙ্গাযাত্রীর ঘরে মুমূর্ষু প্রাণ শতাব্দীর মৃত্যু দেখছে। ইংরেজ সেটলমেন্টে শ্যামপেনের ফোয়ারা। গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি। দিস ওয়ান টু ফেয়ারী কালকুত্তা দিস টু ফেমিন এণ্ড পেসটিলেনস। দিস ওয়ান টু ম্যালেরিয়া এণ্ড কাল আ-জার দিস ওয়ান টু থাগস, দিস ওয়ান টু আওয়ার প্লাণ্ডার এণ্ড-রে এ-প। হউ নচ গার্লস কাম হিয়ার কিস মাই নেটিভ ফেরারি। পাণ্ডুর হয়ে আসছে রাতের আলো। মধ্য রাতের ঘরে ফেরা মাতাল লুটানো কোঁচা সামলে পায়ে পায়ে বাড়ি ফিরছে—বিধুমুখী, ও মাই বিধুমুখী। ল্যাম্পপোস্টকে বলছে—কি দেখছিস মাইরি লম্বু, নেশা করেছি বেশ করেছি, বাপের পয়সায় করেছি, পয়া আছে পয়া খরচের জন্যে তোর কি রে শালা। আমার বিধুমুখী।

বিছানায় উসখুস করলেন নীলমণি। ঘুম আসছে না। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে গঙ্গার হাওয়া আসছে। মধ্যরাতের রাস্তায় খালি শালপাতার ঠোঙা উড়ে যাচ্ছে শব্দ করে। দু-একটা কুকুর ডাকছে দূরে। পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে হীরামণি, তাঁর স্ত্রী। হীরা ঘুমোলে নাকি, হীরা। ঘুমে অচৈতন্য। ঘুমোক ঘুমোক, সারাদিন কাজের শেষ নেই। ঠাকুরবাড়ির কাজ, অত অতিথি সেবা। আস্তে হাত রাখলেন স্ত্রীর গায়ে—হীরা। বাইরে মাঝরাতের মাতাল জড়ানো গলায় চিৎকার করে উঠল—জয় নীলমণি মল্লিক কি জয়। তুমি মাইরি গ্রেট ম্যান।

আমার টাকা আছে মাল খাচ্ছি তোমার টাকা আছে ধম্ম করছো, অতিথি সেবা করছ। লোকে তোমায় মনে রাখবে মাইরি। আমরা 'চতেয় চড়লে ফুট। তুমি অমর। দাউ দাউ দাউ দাউ তোমার নাম। আর একবার জয় বাসি বাবা। তুমি ধাম্মিক মানুষ।

নীলমণি বললেন—শুনছো হীরা মাতালের কথা। জয় জগন্নাথ। নীলমণি জানলার দিকে মুখ করে শুলেন। তারা-ভরা আকাশের পর্দা খোলা জানলায়। ধূপের.গন্ধ থির থির করছে সারা ঘরে। কালো চকচক বর্মা কাঠের শূন্য আরাম কেদারা জানলার পাশে। নীলমণি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন কেদারার দিকে। অন্ধকার ক্রমশ তরল হয়ে আসছে। ওই কেদারাটায় বসে আকাশ দেখতেন পিতা গঙ্গাবিষ্ণু। ওঃ সে কতকাল আগে। গত শতাব্দীতে। শেষ বসে গেছেন ১৭৮৮ সালে। বাবার কথা মনেই পড়ে না, আমি তখন শিশু। হীরা তুমি আমায় সব দিলে কেবল একটি সন্তান দিতে পারলে না। কেন পারলে না হীরা। মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দরজার বাইরে অপেক্ষা করে আছে। যাব গো যাব। আর কয়েকটা দিন সময় দাও। আমার কে রইল বল। হীরার একটা ব্যবস্থা করি। হে জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। ঘুম আসছে যেন। জয় নীলমণি মল্লিকের জয়। হীরা জাগলে।

নীলমণির পিতা গঙ্গাবিষ্ণু মারা গেলেন ১৭৮৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী। নীলমণি তখন শিশু। শিশুপুত্র, স্ত্রী, বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত ভার দিয়ে গেলেন ভাই রামকিষেণ মল্লিককে। কারা এই মল্লিক। এঁদের অনন্ত ঐশ্বর্যের উৎসটাই বা কি! হাজার বছরের ইতিহাসের পাতা উলটাতে হবে। সারা ভারতের অধিকাংশ মানুষ তখন দণ্ডক-মণ্ডলুধারী সংসারত্যাগী সেই রাজার ছেলের উদ্দেশ্যে ঢেলে দিচ্ছে হৃদয়ের আবেগ—বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং স্মরণম্ গচ্ছামি, ধম্মম স্মরণং গচ্ছামি। বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনে আসমুদ্র হীমাচল প্লাবিত। বাংলাদেশের সিংহাসনে তখন পাল রাজারা। এঁরা ছিলেন বৌদ্ধ। সনাতন হিন্দু-ধর্মের ভিত কাঁপিয়ে দিলেন। পালরাজাদের সিংহাসন থেকে ফেলে

দিলেন মহারাজ আদিসুর। আদিসুর ছিলেন হিন্দু। সনাতন হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তলোয়ারের ধার যুক্ত করে তিনি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মকে ঠেকিয়ে রাখলেন।

সেই সময়কার রামগড়, জয়পুর থেকে ৫০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অযোধ্যা প্রদেশের বৈশ্য অধ্যুষিত অঞ্চল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এড়াতে তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে সেখান থেকে পালিয়ে এলেন সনক আঢ্য, সঙ্গে যজ্ঞসূত্রদাতা গুরু ও কুল-পুরোহিত সারস্বত ব্রাহ্মণ জ্ঞানচন্দ্র মিশ্র, কিছু আত্মীয়স্বজন ও বহু অস্ত্রধারী সৈন্য। কোথায় আশ্রয় নেবেন! খুঁজে পেলেন সুরক্ষিত হিন্দুধর্মাঞ্চল—মহারাজা আদিসুরের রাজধানী। ৮৪৭ শকে তাঁর দলবল চলে এল বিক্রমপুরে।

সনকের বাবার নাম ছিল কুশল আঢ্য, রামগড়ে তাঁর অর্থের, বিত্তের, প্রভাবের সীমা ছিল না। ভদ্রলোকের তিন ছেলে—বড় সনক, সোনা ও রুপোর ব্যবসায়ী, সেই কারণে 'সুবর্ণ বণিক', মেজ সনাতন, মণি-মাণিক্যের ব্যবসায়ী, সেই কারণে 'মণি বণিক', ছোট সনকের কারবার গন্ধ দ্রব্য নিয়ে, কর্পূর, মশলা, সেই কারণে 'গন্ধবণিক'। বাংলাদেশে এই তিন বণিক শ্রেণীর এঁরাই আদিপুরুষ। এই সনক আঢ্য পুরাণেও একটু স্থান করে নিয়েছেন :

যা পদ্মগন্ধাঙ্গী সুবর্ণাবর্ণা, বরাটিকাস্তে সনকশ্চ য স্তে।

জয়াপতী বৈশ্যকুলেহি জাতৌ, শ্রীমাধবে কৃষ্ণিকূলে যথাস্তোম্।

বরাটিকা হলেন সনক আঢ্যের স্ত্রী। পদ্মগন্ধা স্বর্ণবর্ণা বরাটিকা এবং সনক জগতে বৈশ্যকুলের এই দম্পতি, কৃষ্ণকুলে রাধামাধব সদৃশ্য।

রামগড় থেকে সনকের সঙ্গে এসেছিলেন ষোল ঘর প্রধান বৈশ্য এবং অনুগত তিরিশ ঘর অপ্রধান বৈশ্য। এঁরাই বাংলাদেশকে দিয়েছেন :

দে (পরে দেমল্লিক), দত্ত, চন্দ্র, আঢ্য, শীল (পরে শীল-মল্লিক), সিংহ, ধর, বড়াল, পাল, নাথ, মল্লিক, নন্দী, বর্ধন, দাস, লাহা, সেন।

সনক আঢ্য শুধু বণিক ছিলেন না, ছিলেন ধার্মিক, দানশীল, সজ্জন,

গভীর বেদজ্ঞ। রাজা আদিসুর খুশী হলেন। রাজা বললেন,
ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মাঝখানে আপনাদের আমি একটি গ্রাম
দান করছি। সনক শুরু করলেন, সোনা, রুপো এবং মূল্যবান
রত্নের ব্যবসা। তাঁর সপ্তডিঙ্গা চলল, ব্রহ্মে, আরাকানে, অন্যান্য
দেশে। অখ্যাত জনপদ হল সুখ্যাত জমজমাট বাণিজ্য কেন্দ্র। রাজা
আদিসুর সম্মান জানালেন তাম্রফলকে :

স্বর্ণ বাণিজ্য করিত্বাদত্রস্থিত বিশাংময়া।
সুবর্ণবণিজিত্যাখ্যা দত্তা সম্মান বর্দ্ধয়ে॥

বসবাসকারী বৈশ্যদের সম্মানার্থে, যাঁরা সুবর্ণব্যবসায়ে দিকপাল, আমি
তাদের সুবর্ণবণিক আখ্যা দিলাম। সেই থেকে গ্রামের নাম হল সুবর্ণ-
গ্রাম, সোনারগাঁ। সেই গ্রাম এখনো আছে, সমৃদ্ধি নেই, আছে
ধ্বংসাবশেষ, আছে দীর্ঘ অতীতের স্মৃতি।

সুবর্ণগ্রামকে শ্মশান করে দিলেন রাজা বল্লাল সেন। অথচ
বল্লাল সেন ছিলেন রাজাদের মধ্যে অসাধারণ। তবে রাজাদের যা
স্বভাব, প্রতিভাবান হলেই একটু খামখেয়ালী মত হবেন। রাজা বিজয়
সেনের বেশী বয়সের সন্তান। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার পুত্র। রাজা যখন
প্রমোদ ভ্রমণে ব্রহ্মপুত্রের ধারে ছাউনী ফেলেছেন সেই সময় বল্লালের
জন্ম। জন্মেই রাজা। সুয়োরাণীর ছেলের ভাগ্যে চিরকাল যা হয়।
তবে আদুরে ছেলে বলেই বখে যাওয়া ছেলে নয়। বল্লাল ছিলেন
ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়। দিগ্বিজয়ী বীর। সুপণ্ডিত সুরসিক কবি, বিজ্ঞানী
জ্যোতিবিদ। যিনি দানসাগর, অদ্ভুত সাগরের মত গ্রন্থের রচয়িতা,
তাঁর মানসিকতা অনুমান করে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয়। প্রথম
জীবনে বৈদিক। পরিণত বয়সে শাক্ততান্ত্রিক। তন্ত্রের জন্যে রাজ্য
ত্যাগ করে ভৈরবী নিয়ে নির্জন বাস। ঐতিহাসিক বলছেন, 'বল্লাল
সেন গৌড় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম নরপতি। 'ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্রধর্মের এমত
অপূর্ব সমাবেশ আর কারো মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁর প্রবর্তিত শাক্ত-
সাধনা গৌড়বঙ্গের সমাজজীবনকে আজও প্রাণবন্ত করে রেখেছে।'

সেই বল্লালের সঙ্গেই ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল সনক আঢ্যের

উত্তরপুরুষ বল্লভানন্দের। মণিপুর অভিযানের সময় বল্লালকে বল্লভ টাকা ধার দিয়েছিলেন। সেই ধার শোধের ব্যাপারে দুজনের গোলমাল হয়ে গেল। রাজা বললেন দেখাচ্ছি মজা। প্রথমে কেড়ে নিলেন পবিত্র যজ্ঞোপবীত। উচ্চবর্ণের সম্মান.কেড়ে নিয়ে রাজা তাঁদের সমাজে হেয় করার চেষ্টা করলেন। অতই সহজ! পৈতে গেছে যাক, পৈতের বদলে গলায় পরব সোনার চেন। সেই থেকে সুবর্ণবণিক সমাজে চালু হল গলায় সোনার চেন পরার প্রথা। অর্থ উপার্জন আর টাকা লেনদেনের মূলঘাঁটি যাঁরা দখল করে বসে আছেন তাঁদের সামাজিক সম্মান আর পতিপত্তি কি অত সহজে হরণ করা যায়। কোষাগারের মালিক আমরা, তুমি রাজা ফতোয়া জারি করে কি করবে আমাদের। টাকা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত হল ধর্মমতের ঠোকাঠুকি। সুবর্ণ-বণিকরা বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী, রাজা বল্লাল শাক্ততান্ত্রিক। যতই অর্থের জোর থাক, রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্যে বাস করা যায় না। গৌড় ছেড়ে দলে দলে বণিকরা চলে এলেন, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, সুবর্ণরেখার তীরে মেদিনীপুর অঞ্চলে বিশেষত তাম্রলিপ্তে সবশেষে হুগলীর বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র সপ্তগ্রামে।'

এই সব দেশ ছাড়া, সাহসী বণিকরাই ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠলেন। ষোড়শ শতকে এঁদের বাণিজ্যের অংশীদার হলেন হুগলীর পর্তুগীজরা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ, চন্দননগরের ফরাসী, কলকাতার ইংরেজরা। এই মেলামেশার ফলে শুধু অর্থ নয়, সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় সম্ভব হল. সমাজে মহিলাদের সম্মান দেবার ইওরোপীয় আদর্শ এঁরাই প্রথম আত্মস্থ করলেন।

কলকাতা এখনও ছিল। কলকাতা পুরাণেও ছিল। সতীপীঠ, তন্ত্রপীঠ। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেহুলা পর্যন্ত ত্রিকোণাকৃতি ভূভাগ। রাজা বল্লাল সেন তান্ত্রিকরা যাতে অন্যের সংস্পর্শ পরিহার করে নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মকর্ম চালিয়ে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উত্তরে দক্ষিণেশ্বর থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এক ত্রিকোণাকৃতি ভূভাগ

তাদের জন্য সংরক্ষিত করেন। কালীঘাট ছিল এই কালিকাক্ষেত্রের নাভিকেন্দ্র :

পশ্চিমে সরস্বতী সীমা পূর্বে কালিন্দীকা মাতা।
একবিংশতি যোজনৈশ্চ মিতো কিলকিলাভিবঃ॥

[তন্ত্র]

এই তন্ত্রপীঠেই পড়ল ম্লেচ্ছ স্পর্শ। ১৬৯০ সাল। চার্নকসাহেব এসে নামলেন সুতানুটিতে। জন্ম নিল আর এক কলকাতা। আজকের কলকাতা—সিটি অফ প্যালেস এণ্ড স্লামস, পভার্টি এণ্ড অ্যাফ্লুয়েন্স। তখনকার গোবিন্দপুর। মানী-জ্ঞানী-গুণী, অর্থবান মানুষের সম্পন্ন জনপদ। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের অমাত্যেরা প্রতিষ্ঠা করেছেন গোবিন্দজীর মন্দির। কলকাতার চোরবাগানের মল্লিকদের পূর্বপুরুষ জয়রাম মল্লিক কিসের টানে চার্নকের আগেই সপ্তগ্রাম ছেড়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা ঠিক করলেন একটা দুর্গ বানাবেন গোবিন্দপুরে—ফোর্ট উইলিয়াম। জয়রামের গোবিন্দপুরের আদি বসতবাটী পড়ে গেল ফোর্টের এলাকার মধ্যে। ইংরেজ পরিবর্তে উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় তাঁকে এক খণ্ড জমি দিলেন বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারও এই একই অঞ্চলে জমি পেলেন। মল্লিকরা পাকাপাকিভাবে বসলেন, তাঁদের রাজ্যপাট বিস্তার করলেন।

মল্লিক পরিবারের গোত্রপটে জয়রাম হলেন পঞ্চদশ পুরুষ। এঁরা আদতে ছিলেন শিল। প্রথমপুরুষ যতদূর জানা যায় মধু শিল। ত্রয়োদশ পুরুষে এসে যাদব শিল এবং তাঁর দু'ভাই মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে মল্লিক উপাধি পেলেন। পারস্য ভাষায় মল্লিক শব্দের অর্থ—রাজা অথবা আমির।

জয়রাম থেকে নীলমণি চারপুরুষের ব্যবধান। অর্থাৎ জয়রাম হলেন নীলমণির ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা। নীলমণির পিতা গঙ্গাবিষ্ণু তাঁদের পারিবারিক ব্যবসাকে বাড়াতে বাড়াতে কোটিপতি হয়েছিলেন। সুদে টাকা খাটিয়েছেন। তখন তো এখনকার মত ব্যাংক ছিল না।

মল্লিকরাই ছিলেন তখনকার ইমপিরিয়াল ব্যাংক। সারা ভারতে বাণিজ্য করেছেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত ছিল তাঁদের ব্যবসার মূল ঘাঁটি। ভারতের বাইরেও তাঁরা ব্যবসা করেছেন—চীন, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন।

টাকা যেমন রোজগার করেছেন দুহাতে তেমনি খরচও করেছেন সৎকাজে—দেব সেবায়, অতিথি সৎকারে, দরিদ্রনারায়ণ সেবায়। বদান্যতা মিশে গেছে এঁদের রক্ত কণিকায়। দান ছাড়া এঁরা থাকতে পারেন না। বল্লাল সেনের দেশের মানুষ তো দানসাগরই হবেন। বল্লাল তাঁর 'দানসাগরে' লিখেছিলেন না?

অনিত্যং জীবনং যস্মাদ্ বসু চাতীব চঞ্চলম্।
কেশেষ্বিব গৃহীতঃ সন্ মৃত্যুপা দানমাচরেৎ॥

মৃত্যু মানুষের ঝুঁটি ধরে টানছে, জীবনের কি দাম আছে রে ব্যাটা? ধন তোর আজ আছে, কাল থাকবে কিনা কেউ জানে না—তবে? যা পারিস সৎপাত্রে দান করে যা।'

কিং ধনেন করিষ্যন্তি দেহিনো ভঙ্গুরাশ্রয়াঃ।
যদর্থে ধনমিচ্ছন্তি তচ্ছরীরমশাশতম্॥

তোমার শরীর তো আজ আছে কাল নেই। মৃত্যু এসে ড্যাং ড্যাংয়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে হতভাগা টাকা টাকা করে মরছ কেন?

গঙ্গাবিষ্ণু ছিলেন রাজা বল্লালের সেকেণ্ড এডিশান। দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে, অভিজ্ঞ ভিষকদের দিয়ে ওষুধ তৈরি করে দুস্থ রোগীদের সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। খুলে দিলেন দানছত্র। আমি গঙ্গাবিষ্ণু যখন বেঁচে আছি তোমরা কেন অভুক্ত থাকবে। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকেন্দ্র খুলে প্রপীড়িত মানুষের সেবার কাজে নামলেন। ধর্মে আর কর্মে, সেবায় আর পরিবর্তে, অর্থে আর বদান্যতায় গঙ্গাবিষ্ণু ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নীলমণি তো তাঁরই ছেলে।

গঙ্গাবিষ্ণুরা ছিলেন দু-ভাই। ভাইয়ের নাম রামকিষেণ। রামকিষেণের তিন ছেলের নাম বৈষ্ণব, সনাতন, আনন্দিলাল। আনন্দি অল্পবয়েসেই মারা গিয়েছিলেন। গঙ্গাবিষ্ণু মৃত্যুর সময় একটি উইল করে সমস্ত

সম্পত্তি ভাই রামকিষেণকে দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন বিধবা স্ত্রী আর শিশু নীলমণিকে দেখার কথা। রামকিষেণ তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। তিনি গঙ্গাবিষ্ণুর পর আরো কুড়ি বছর জীবিত ছিলেন। যৌথ সম্পদ ও সম্পত্তি বাড়িয়েছিলেন। নিজের ছেলেদের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র নীলমণিকে মানুষ করেছিলেন, সাবালক করেছিলেন। মৃত্যুর আগে একটা উইল করে দু'ছেলে আর নীলমণি প্রত্যেককে বিষয়সম্পত্তি সমানভাবে ভাগ করে দিয়ে গেলেন।

(২)

এত ভোরেই তুমি গাড়ি বের করতে বলেছো? গঙ্গাস্নানে যাবে বুঝি?

উদাস চোখে নীলমণি স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তিরিশ বছরের জীবনসাথী। দুঃখ সুখের অংশীদার। জীবনে দুঃখ আর পেলেন কোথায়? শুধুই তো সুখ। কে বলেছিলেন, জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এই তো আমি নীলমণি এই তো আমার স্ত্রী হীরামণি, কিসের দুঃখ। অর্থ, বিত্ত, সম্পত্তি, যশ, খ্যাতি, সুনাম। জীবন যেন ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া পূর্ণ চাঁদের স্নিগ্ধ আলো।

না গো চান করতে যাবো না। শরীরটার তেমন জুত নেই। যাবো চোরবাগানে। মন্দিরের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যাবার আগে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে তো!

তোমার আজকাল এক কথা—যাবার আগে, যাবার আগে। তোমাকে এত তাড়াতাড়ি যেতে দিচ্ছে কে? তুমি গেলে তোমার কাজ করবে কে? তোমার অতিথিশালা, পুরীর যাত্রীনিবাস, তোমার গঙ্গার ঘাট, ঋণের দায়ে দেউলে মানুষ তুমি গেলে কার কাছে ছুটে আসবে! কে চালাবে তোমার দাতব্য চিকিৎসালয়? কে বসবে তোমার আখড়াই গানের আসরে? যাব বললেই যাওয়া, তাই না?

টানা বারান্দায় নীলমণি ধীর পায়ে খানিক ঘুরে এলেন। স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি দেখবে। তুমি কি যে সে মেয়ে?

আমি তো যৌথ পরিবারের বাইরে তোমার জন্যে আলাদা কিছু করে যেতে পারলুম না। ওই চোরবাগানের জগন্নাথ দেবের মন্দিরটা রইল, আর রইল অতিথি ভবন। একটা কথা তোমাকে বলে রাখি হীরা, সময়ে অসময়ে এ বাড়িতেই যেই আসুক, অভুক্ত যেন ফিরে না যায়। রোজ অতিথি সৎকারের যে ব্যবস্থা আছে তাও যেন বন্ধ না হয়। জেনে রাখবে নীলমণি হল-ফ্রেণ্ড অফ দি পুওর। এটা আমার গর্বের কথা নয়, প্রাণের কথা, ঈশ্বরের আদেশ।

সবাই বলছে মন্দিরটা নাকি বিলিতি ডিজাইনে হচ্ছে।

বিলিতি কি গো? ওটা আমার একটা খেয়াল বলতে পার, আমি গীর্জার ডিজাইনে ইচ্ছে করেই মন্দিরটা করাচ্ছি—জান তো যিনি গড, তিনি আল্লা, তিনিই ভগবান—সব সমান। গোঁড়ারাই কেবল ভগবানের জাত আলাদা করেছে। মন্দিরের চূড়োটা গীর্জার মত, ভেতরে শ্রী জগন্নাথ। বলুক না, লোকে বলুক, নীলমণির খেয়াল।

হীরামণি চলে যাচ্ছিলেন। সকালের সময় বড় সংক্ষিপ্ত। যদিও মল্লিক বাড়ির সময়ের মাপ সাধারণ মাপের চেয়ে দীর্ঘ। চারটের সময় দ্বিপ্রহর। সন্ধ্যা ঘোষিত হয় রাত্রির মধ্যযামে। প্রতিদিন শ' পাঁচেক অতিথি সেবার খিচুড়ি চেপেছে পাকশালের বিশাল উনুনে কড়া না বলে কলড্রন বলাই ভাল। নীলমণি বললেন—শোনো।

হীরামণি যেতে যেতে ফিরে এলেন।

আমি ওই ব্যাপারটা একরকম ঠিকই করে ফেললুম, বুঝেছো?

কোন্ ব্যাপার। নীলমণির গো অনেক ব্যাপার। পুরীর গৌবরারশাহী, হরচণ্ডীশাহার আগুনে বহু পরিবারের ঘর পুড়ে গেছে। বর্ষা আসার আগেই নীলমণি নতুন করে ঘর তৈরি করিয়ে দিচ্ছেন। সেবার পুরীর অথরনালায় বিশাল এক তীর্থযাত্রীর দলকে দেখেছিলেন সেতু পার হতে পারছে না। টোল দেবার মত অর্থের অভাবে। ভক্তপ্রাণ নীলমণি এগিয়ে গেলেন সেতুরক্ষীদের কাছে। কত টাকা লাগবে ভাই?

অনেক টাকা মশাই।

আমি এঁদের যাওয়া আর আসা, দুটোর পরিমাণই জানতে চাই।

সেতো আরো অনেক টাকা। একটু যেন তাচ্ছিল্যের ভাব কর্তৃপক্ষের উত্তরে।

আমি কলকাতার নীলমণি মল্লিক। আমার কাছে পুরো টাকাটা নগদে নেই, আপনাদের কালেকটার সাহেবকে বলুন আমার ভাই বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিকের নামে পুরো টাকাটার একটা ড্রাফ্‌ট লিখে দিচ্ছি, টাকাটার আদায় আপনারা কলকাতা থেকে অবশ্যই পেয়ে যাবেন।

কালেকটার সাহেব দফতর ছেড়ে দৌড়ে এলেন, কে এই বড়মানুষ, যার এত বড় দরাজ দিল, হাজার মানুষের আর্থিক বোঝা একার কাঁধে তুলে নিতে চাইছেন।

তুমি কি করে বুঝবে সাহেব! তোমাদের সবটাই তা কার্য্যকারণের নিয়মের বাঁধা ছকে চলে। আমি যে জগন্নাথের সেবক। এতগুলো ভক্তপ্রাণের বেদনায় মন্দিরের দেবতা যে টলে উঠেছেন!

বাবু আমি বিদেশী হলেও, ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইওর ফাইনেস্ট অব সেন্টিমেন্টস। টাকা তোমাকে দিতে হবে না। আই অ্যালাউ অল অফ দেম টু গো এণ্ড উইথ দেম গোজ দি টোল ফর এভার। এই মানুষটির জন্যে আজ থেকে টোল উঠে গেল। বল, 'জয় নীলমণি মল্লিকের জয়'।

তোমার কোন ব্যাপারটা বুঝবো বল? দাঁতনে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে লাখ লাখ টাকা খরচ করে নাটমন্দির তৈরি করিয়ে দিচ্ছ, সেই ব্যাপারটা? নাকি স্ট্র্যাণ্ড রোডে গঙ্গার ধারে স্নানযাত্রীদের জন্যে যে ঘাট বানাচ্ছো সেইটা? নাকি আজ রাত্তিরে নিধুবাবুদের ফুল আখড়াইয়ের আসর বসবে, চলবে সারা রাত, সেই কথা বলতে চাইছ? হীরামণি প্রশ্ন ভরা মুখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সেই ব্যাপারটা গো, বুঝতে পারছো না? তোমার ছেলে! আমাদের একটা ছেলে চাই না! কে ওয়ারিশ হবে আমাদের এত বড় বিষয় সম্পত্তির। কে করবে আমার মুখাগ্নি?

তুমি আজকাল কেবল মৃত্যুর কথা বল কেন গো! স্বার্থপরের মত আমাকে একলা ফেলে চলে যেতে চাও বুঝি!

আহা মৃত্যুর কথা কি বলা যায় কিছু। কখন এসে বলবে— চলে আয় নীলমণি। ব্যবস্থা তো একটা করা চাই? উকিল মশাইকে আইন মোতাবেক কাগজপত্র তৈরি করতে বলেছি। দত্ত বাড়ির সর্বসুলক্ষণযুক্ত ওই ছেলেটিকেই আমরা দত্তক নোবো। কচি শিশু, কিন্তু ভাবটা দেখেছো এখন থেকেই যেন রাজা হবার জন্যেই জন্মেছে, কপালে রাজতিলক নিয়ে। রাজেন্দ্রই আমাদের ছেলে হবে। কি তোমার মত আছে তো!

তোমার মতই আমার মত। যা করছো ঠিক করছো। প্রভুর ইচ্ছে। এই আমি সার বুঝেছি। হীরামণি মুচকি হেসে চলে গেলেন।

পাথুরিয়াঘাটার রাস্তা দিয়ে ফিটন চলেছে। তেজীয়ান সাদা ঘাড়া। আসনে বসে আছেন মানুষের মনের রাজা বাবু নীলমণি মল্লিক। যেই দেখছে হাত তুলে নমস্কার করছে। তুমি যে রাজার রাজা।

(৩)

শ্রীপঞ্চমী।

বাইরের ঘরের ডিভানে বসে দুই ভাই নীলমণি আর বৈষ্ণব দাস।

সাজানো গোছানো সব ঠিক আছে তো? নাচঘরে লাল কার্পেট পড়েছে তো? ঝাড়গুলো সময়ে ঠিক জ্বলবে তো? আতরওয়ালা এসেছিল? ফুল এসেছে তো? সারা বাড়িটা ঝক ঝক করছে তো। দেউড়ীতে কে থাকছে দাদা? খানা, পিনা ঠিক থাকছে তো? মল্লিক-বাড়ির শ্রীপঞ্চমীর উৎসব। যে সে ব্যাপার নয়। কে কে আসছেন দাদা?

সুপ্রীম কোর্টের জজ সাহেবরা আসছেন। আসছেন লাটবাহাদুর, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা, আসছেন সারা কলকাতার গণ্যমান্যরা।

সারা রাত ধরে মাইফেল হবে মল্লিকবাড়ির হল ঘরে। বড় বড় গাইয়েরা আসছেন। জোর কমপিটিসান হবে। শ্রেষ্ঠ গাইয়ে পাবেন প্রচুর পুরস্কার। নাচ হবে। বেনারস থেকে আসছেন ভারত বিখ্যাত দুই নর্তকী—নিকি আর আসরুন।

সন্ধ্যের অন্ধকার নামলেই ঘরে ঘরে জ্বলে উঠবে ঝাড় লণ্ঠন। কুঁচো কুঁচো আলো ছিটকে পড়বে পুরু কার্পেটের ওপর সুন্দরী নারীর হাসির মত। দামী আতর ফিস ফিস করে ছিটকে আসবে আতরদান থেকে। বসরাই গোলাপ লাল নেশা ছড়াতে থাকবে। একে একে ফিটন এসে ঢুকবে দেউড়িতে। লালটকটকে সাহেব মেমের ছড়াছড়ি—হোয়্যার ইজ নীলমণি। আ হিয়ার হি কামস্ আওয়ার মোস্টে মডেস্ট এণ্ড অ্যাকমপ্লিশড ফ্রেণ্ড। ফট করে খোলা হবে প্রথম শ্যামপেনের বোতল। ফোয়ারার মত আকাশের দিকে ছিটকে উঠবে ফেনা। সাহেবরা হৈ হৈ করে উঠবেন—সেলিব্রেট শ্রীপঞ্চমী। লেডি গভার্নার চিকের আড়ালে মেয়েদের কাছে গিয়ে পান চাইবেন—রূপোর তবক মোড়া, কেয়া খয়ের দেওয়া, ছাঁচিপান, গোলাপী আতরের গন্ধ, বেনারসী সুতির ছিটে দেওয়া। আস্তে আস্তে রাতের নেশা হবে। পাহাড়ী ঝর্ণার মত নিকি-আসরুনের পা থেকে ঝরে পড়বে নাচের তাল।

শ্রীপঞ্চমীর মত রথযাত্রাও মল্লিকবাড়ির একটি প্রাচীন উৎসব। প্রাচীন উৎসব হোলি। ঘরের মেঝেতে পায়ের পাতা ডুবে যায় এত ফাগ। ওস্তাদ গাইছেন, হোলি খেলত নন্দকুমার। কুমারের র' য়ে সোম। তবলচী চাপড় মারছেন মেঝেতে। রঙীন ফাগ উড়ছে রঙীন মেজাজের মত উৎসব মুখর মল্লিকবাড়িতে সন্ধ্যার আসরে বড় মানুষের ভিড়। সকালে অতিথি ভবনে আর্তসেবা। নীলমণির অফুরন্ত তহবিল কন্যাদায়গ্রস্তের জন্যে উন্মুক্ত, উন্মুক্ত ঋণদায়গ্রস্তের জন্যে, উন্মুক্ত দেবসেবায়, মন্দির নির্মাণে। তাইতো নীলমণি মল্লিক সুবর্ণবণিক সমাজের দলপতি।

শরীর কিন্তু ভাঙছে, বড় দ্রুত ভাঙছে। চোরবাগানে গীর্জার ঢঙে

জগন্নাথ দেবের মন্দির তৈরি হয়েছে। মাতুলালয় থেকে জগন্নাথজীকে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতিথি ভবন নির্মাণ করেছেন আয়নিক ঢঙে। স্ত্রী হীরামণিকে নিয়ে সকালে চলে আসেন। বাড়ি ফেরেন সূর্য যখন প্রায় পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। শরীরের ওপর এক ধরনের অত্যাচারই চলেছে, বছরের পর বছর। উন্মুক্ত বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে দেখছেন রাজেন্দ্র খেলা করছে লনে। রক্তের যোগ না থাকলেও তোমাকে নিয়ে এসেছি তোমার পেডিগ্রি দেখে। তাছাড়া পরিবেশ। মল্লিকবাড়ির কয়েক শো বছরের ঐতিহ্যের ছাচে ঢালাই হবে তোমার চরিত্র। তুমি হবে লাইক ফাদার লাইক সান।

হেমন্ত কাল। হেমন্ত কেন হবে, শরৎই তো। ওই তো শেষ বেলার সোনালী মেঘ ফুলে উঠেছে পূব আকাশে। পূজো আসছে। শিউলি ফুলে গাছ সাদা হয়ে থাকে ভোরের দিকে। কিন্তু শীত শীত করছে কেন? শীত আসতে তো অনেক দেরী। নীলমণি ঘরে গিয়ে চাদর টেনে শুলেন। হীরামণি এখন অন্তঃপুরে। জ্বর আসছে। আজ আর ঠাকুরঘরে যেতে পারবো কি? সন্ধ্যার শাঁখ বাজছে। বাদুড় উড়ছে অস্ত সূর্যের আকাশে।

খবর ছড়িয়ে পড়ল সারা কলকাতায়, নীলমণি মল্লিক গুরুতর অসুস্থ। যে সব পরিবার মাসোহারা পেতেন তাঁদের মুখ শুকোলো। বিপদের দিনে দলপতি নীলমণি যাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন তাঁরা অসহায় বোধ করলেন। বাংলার সংগীত জগৎ একজন প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক হারাবার সম্ভাবনায় ম্রিয়মাণ হলেন। সারাদিন উৎসুক মানুষের ভিড়, রাস্তায়, প্রাঙ্গণে, সিঁড়িতে।

আজ কত তারিখ হীরামণি? নীলমণি ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন হীরামণি মুখটা কানের কাছে নামিয়ে এনে ধীরে ধীরে বললেন, দোসরা সেপ্টেম্বর। কত সাল গো? এই ১৮২১ সাল তবে প্রস্তুত হও। ওই দেখ সূর্য ডুবছে, আমাকে যে এবার যেতে হবে।

হীরামণি চোখ মুছলেন। এতকালের জীবনসঙ্গীকে বিদায় দিতে

হবে। এই নাকি নিষ্ঠুর পৃথিবীর নিয়ম? কেউ আগে যায়, কেউ যায় পরে।

ওদের ডাকো, আমি প্রস্তুত।

গৃহভৃত্যদের ডাকা হল। নীলমণি চেয়ারে বসে বললেন, নিয়ে চল ঠাকুরবাড়িতে।

শেষ প্রার্থনা জানালেন, শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করলেন ঠাকুরের পায়ে। আদেশ করলেন, চেয়ার ওঠা, নিয়ে চল গঙ্গার ঘাটে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে চলেছেন গঙ্গাযাত্রী নীলমণি। সঙ্গে দু ব্যাগ রূপোর টাকা। যাবার পথে দুপাশের মানুষকে দুহাতে বিলিয়ে যাচ্ছেন। পাত্রাপাত্র বিচার করছেন না।

বাহক বাহিত হয়ে, দু'হাতে অর্থ বিলোতে বিলোতে নীলমণি এলেন জাহ্নবী তীরে। ঝুলির সমস্ত অর্থ বিলিয়ে দিলেন আর্তদের। আর নেই। চোখের সামনে কলল্লাবিনী গঙ্গা। ওই তো দিনের শেষে, ঘুমের দেশে, ঘোমটা পরা ওই ছায়া। কাজ ভাঙানো গান গেয়ে চলেছে। তোমাদের চোখে জল কেন? প্রিয়জনদের দিকে তাকিয়ে নীলমণি বললেন চোখ মোছো। তোমরা আমাকে চোখের জলে বিদায় দেবে কেন? আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও। ওই দেখো অনন্তের পথ চলে গেছে। আমাকে তোমরা দুর্বল করে দিও না। প্রত্যেকের হাত ধরে বললেন, কোনো অন্যায় করে থাকলে ক্ষমা কোরো ভাই। আর তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৮২১, মাত্র ৪৬ বছর বয়সে, দীনবন্ধু নীলমণি মল্লিক সজ্ঞানে ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে, মহালোকে যাত্রা করলেন। রাজেন্দ্রের বয়স তখন মাত্র তিন। যোগ্য স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হীরামণি, নীলমণির রেখে যাওয়া সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। যেমন চলছিল তেমনি চলবে বরং আরো ভাল চলবে।

(৪)

পৈতৃক সম্পত্তি দু[illegible]বার কথা। হাফ গঙ্গাবিষ্ণু হাফ রাম-

কিষেণ। গঙ্গাবিষ্ণুর সেই অর্ধেকের অংশীদার হবার কথা নীলমণির। গঙ্গাবিষ্ণু কোনো উইলে নাবালক নীলমণিকে কোনো সম্পত্তি দিয়ে যাননি। ভার দিয়েছিলেন রামকিষেণকে। রামকিষেণের তিন ছেলের মধ্যে দুই ছেলে জীবিত ছিলেন। তাঁরা নীলমণিকে বললেন, তোমার তো একজন মাত্র দত্তক সন্তান, আমরা দুজন। সম্পত্তি তিন ভাগ হলে ক্ষতি কি? নীলমণি হেসে বলেছিলেন, তাই তো হবে ভাই। সেটাই তো স্বাভাবিক। মৃত্যুর সময় নীলমণি তাঁর একের তিন অংশ শিশু রাজেন্দ্রকে উইল করে দিয়ে গেলেন। সর্ত রইল রাজেন্দ্রকে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত মার কথা অনুসারে চলতে হবে।

নীলমণির মৃত্যুর পর বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মল্লিকদের মত অটুট যৌথ পরিবারেও একটু অশান্তির মত হয়ে গেল। নীলমণির দুই ভাইয়ের নাম—বৈষ্ণবদাস আর সনাতন। সনাতন মারা যাবার সময় তাঁর ভাগের সম্পত্তি বৈষ্ণবদাসকে দিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল গুরু দায়িত্ব—দুই মেয়েকে মানুষ করা, বিয়ে দেওয়া, বিধবা স্ত্রীর দেখাশোনা করা।

সেই বিধবা স্ত্রী বিন্ধ্যামণি এতদিনে তেড়েফুঁড়ে উঠলেন। নীলমণির মৃত্যুর বছর না ঘুরতেই সুপ্রীম কোর্টে ঠুকে দিলেন মামলা। আমার সম্পত্তি আমাকে দাও, পার্টিশানও চাই। রাজেন্দ্র এবং মা হীরামণি বিষয় ভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। যৌথ পরিবারের অটুট বন্ধনে থাকায় আপত্তি কি? রাজেন্দ্র ঠুকে দিলেন। পাল্টা কেস। চার বছর চলল আইনের লড়াই। সুপ্রীমকোর্ট রায় দিলেন, সনাতন উইল করে গেছেন বৈষ্ণবের নামে। বৈষ্ণবই মালিক। তবে হ্যাঁ, নীলমণি মল্লিকের অংশের সঙ্গে পার্টিশানটা হয়ে যাক। হীরামণি চার বছরের ছেলে রাজেন্দ্রর হাত ধরে পাথুরেঘাটার বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন চোরবাগানে নীলমণির তৈরি করে যাওয়া জগন্নাথদেবের মন্দির সংলগ্ন অতিথি ভবনে।

হীরামণি প্রথমেই রাজেন্দ্রর মানুষ হবার ব্যবস্থা পাকা করলেন। সুপ্রীমকোর্টকে জানালেন একজন ভাল অভিভাবক চাই। অভিভাবক

হয়ে এলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার জেমস উইয়ের হগ, পরে যিনি ব্যারনেট হয়েছিলেন, হয়েছিলেন রেজিষ্ট্রার। এই ভদ্রলোক রাজেন্দ্রর ভেতর থেকে রাজবাহাদুর রাজেন্দ্রকে বের করে এনেছিলেন।

এদিকে স্বামীর দানধ্যান, বদান্যতা শুধু বজায় নয়, বাড়াতে গিয়ে হীরামণির হিমসিম অবস্থা। পুরোটাই তো অর্থের খেলা। এস্টেট থেকে অর্থবরাদ্দ সীমিত। আত্মীয়স্বজনদের বাধা। শত্রুতা। এমন কি জীবনহানির ভয়। তবু তিনি চালিয়ে গেলেন হাসিমুখে। ছেলে বড় হয়ে দেখুক, কোন আদর্শের পথিক হবে তার ভবিষ্যৎ জীবন। কোর্ট অফ ওয়ার্ড নাই-বা টাকা দিল। নিজের সম্পত্তি বন্ধক রেখে, বিক্রি করে তিনি নিত্য অতিথিসেবা, দুস্থকে দান, বিদ্যা শিক্ষার জন্যে অর্থ সাহায্য, আশ্রিতদের অনেকের জন্যে কোঠাবাড়ির ব্যবস্থা করা, কোনো কাজই বাকি রাখলেন না। স্বামীর কালের গর্বকে প্রবাহিত রাখলেন। নীলমণি মল্লিকের মৃত্যুর বিশ বছর পরেও সাধারণ মানুষ দল বেঁধে বাড়ির সামনে এসে হেঁকে যেতো—জয় নীলমণি মল্লিকের জয়।

ওয়েলার ঘোড়ায় টানা লাল আর হলদে রঙের ভিকটোরিয়া গাড়ি এসে দাঁড়াল, চোরবাগানের মল্লিকবাড়ির সদর দরজায়। নেমে এলেন হগসাহেব ; হাতে একটা তারের খাঁচা। খাঁচায় এদেশে বিরল দুটো বিদেশী পাখি। হোয়্যার ইজ মাই সান রাজেন্দ্র। টোমার জন্য দুটো পাখি আনিয়েছে। কিপ দেম। টেম দেম। ফিড দেম। অ্যাকোয়্যার এ টেস্ট ফর দি ন্যাচারাল লাইফ, মাই বয়। ইউ মাস্ট বি ভেরি গ্রেট। গ্রেটার দ্যান ইওর ফাদার, ইওর গ্র্যাণ্ডফাদার। ইউ মাস্ট কার্ভ এ নেম ফর ইওর ফ্যামিলি।

ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, চারুকলা, কারুকলা, প্রকৃতি বিজ্ঞান, বিদেশী ভাষা, বিদেশী রুচি, জীবনের যা কিছু সুন্দর, সবকিছু দিয়ে কিশোর রাজেন্দ্রকে সাজিয়ে দিলেন স্যার জে ডবল্যু হগ। ক্ষুদ্র রাজেন্দ্রর মনে বৃহৎকে মুক্ত করে দিলেন। নাল্পে সুখমস্ত। অল্পে তুমি সুখী হবার ছেলে নও। তুমি বৃহতের জন্যে বৃহত্তর, মহানের জন্যে মহত্তর। হগ-সাহেব রাজেন্দ্রকে ভর্তি করে দিলেন হিন্দু কলেজে। রাজভাষা তো

শিখবেই, ডোন্ট নেগলেট বেঙ্গলী মাই বয়। দেশ-বিদেশের বই পড় পৃথিবীটাকে জানো। ওয়ার্ল্ড ইজ এ বিউটিফুল প্লেস। এর ফ্লোরা, ফনচ, জীবজগৎ। রোম, গ্রীস, ইতালি, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, ললিতকলা, সব তোমাকে জানতে হবে। বি এ কালচারড ম্যান। বি এ নোবল ম্যান।

রাজেন্দ্র তাই হলেন। সংস্কার ছিল ভাল তার উপর পড়ল ট্রেনিং। রুচির ঐশ্বর্য ফুটে উঠল। তৈরি হল মন আর মেজাজ। চোরবাগানের মল্লিকবাড়ির অতিথি ভবনের দালানে বসে হগসাহেব জাপানী পায়রার লম্বা লেজের পালক ছাঁটছিলেন কাঁচি দিয়ে। রাজেন্দ্র এলেন। ষোল বছরের স্বাস্থ্যবান যুবক। আংকল আই হ্যাভ এ প্ল্যান। আই ওয়ান্ট টু কনস্ট্রাকট এ প্যালেস, এ মার্বল প্যালেস। যার স্থাপত্যে থাকবে ইতালির মেজাজ, যার মেঝেতে পাতা থাকবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শ্বেত-পাথরের ঐশ্বর্য। যার ঘরে ঘরে ঝুলবে আশ্চর্য্য সব ঝাড়লণ্ঠন। যার সবুজ লনে থাকবে অসাধারণ সব ভাস্কর্য। পুরো প্রাসাদটা হবে একটা মিউজিয়াম। একপাশে থাকবে চিড়িয়াখানা। কলকাতার প্রথম জু হবে আমার বাড়িতে।

দ্যাটস এ ভেরি গুড আইডিয়া মাই সান। ইমপ্লিমেণ্ট ইট। আমি তোমাকে সাহায্য করব উইথ মাইট এণ্ড মেন। রাজেন্দ্রর মা হীরামণি মারা গেছেন। রাজার বয়স তখন মাত্র এগারো। এগারো থেকে ষোল এই পাঁচ বছরে নিঃসঙ্গ কিশোর মনে, চরিত্রে আরো দৃঢ় হয়েছেন। আরো স্বাবলম্বী হয়েছেন। সংস্কৃত শিখেছেন, শিখেছেন পারসী আর ইংরেজী। পঁচিশ বিঘা জমির ওপর ভিত পড়ল। শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের নিয়ে এলেন হগসাহেব, নিয়ে এলেন ভাল ভাল দেশ-বিদেশের কারিগর। সব মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ হাজার। ইতালি এবং ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছেন বড় কারিগর। চোরবাগানে তাঁবু পড়েছে। হৈ হৈ ব্যাপার। মল্লিকদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। নীলমণি মল্লিকের ছেলে রাজেন মল্লিক দেখিয়ে দেবে এইবার। সাহেব মিস্ত্রীদের সেরা কাজ।

হগসাহেব টেবিলে আর্কিটেকট প্ল্যানটা মেলে ধরলেন। পাশে রাজেন্দ্র। কাম মাই সান। দেখ কি জিনিস হচ্ছে। দিস ইজ নর্থ। উত্তরে থাকছে ভেলভেট গ্রীন লন। লনে থাকছে বিশাল ফোয়ারা। ফোয়ারার ভাস্কর্য তুলে ধরবে ঋতুচক্রের আবর্তন—সাইকল অফ সিজনস। রাতে আলোকিত। এটা হবে ফরাসী ধরনের কাজ। এই দিকেই থাকছে জলাশয়। এখানে থাকছে ইতালিয় ঢঙের একটি ফোয়ারা, ফোয়ারায় থাকছে ট্রিটনস এবং মারমেডস। থাকছে এক-জোড়া স্ফিংকস্। জাপানী একটি মন্দিরের প্রতিরূপ। আর থাকছে একজোড়া জাপানী ভাস। পশ্চিমের লনে থাকছে আর একটি ফোয়ারা, চারিদিকে থাকছে নেপচুনের মূর্তি। রাজা পরে এই লনে বসিয়েছিলেন—গডেস অফ ফরচুন, ভাগ্যের দেবীকে, গৌতম বুদ্ধ, দশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের দশটি প্রাচীন ভাস্কর্য, মার্কারি, ভেনাস, একটি মেয়ে মা ও শিশু, চারটি জাতির মুখ, রেড ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো, মঙ্গোল, ককেসিয়ান, একটি ইংরেজ গরু। গরুর মূর্তির মালিক ছিলেন—স্যার এলিজা ইমপে, বাংলার প্রথম প্রধান বিচারপতি।

আচ্ছা এইবার এসো বাড়িতে এই হল তোমার বড় বড় থাম-ওয়ালা বারান্দা। বারান্দা দিয়ে ঢুকছো রিসেপশান হলে, রিসেপ-শান হল থেকে আসছো মার্বেল চেম্বারে, সেখান থেকে যাচ্ছো বিলিয়ার্ড চেম্বারে। এই দেখ বাড়ির ভেতরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গনের এক-পাশে প্রধান উপাসনা কক্ষ। এইবার দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে উঠছো দোতলায়, প্রথমঘর, বারান্দা, চারদিকেই বারান্দা, এইটা হবে দরবার হল। নীচে কোর্টইয়ার্ড ছাড়া চারটে ঘর, দোতলায় ছটা ঘর। বাইরের কাজ হবে গ্রীক বা করিনথিয়ান স্টাইলে, ভেতরে থাকবে ক্ল্যাসিক্যাল আর্চ, ডোরিক আর রোমান স্থাপত্য।

হুগলী ডকে জাহাজ ভিড়েছে। দেশ-বিদেশের মূল্যবান মার্বেল এসেছে রাজেনবাবুর বাড়ির জন্যে। বিরানব্বই রকমের মার্বেল বসবে, মেঝেতে, দেয়ালে, টেবিলটপে, মূর্তির বেদীতে। ক্লিয়ারিং এজেন্টের

হাতে শিপিং লিস্ট। রাজেন্দ্র একবার চোখ বোলালেন, পাশে দাঁড়িয়ে বিদেশী স্থপতি। পিঁয়াতোত্তরো, বড় দুর্লভ পাথর, সারা ত্বকে ছড়িয়ে আছে সোনালী রেখা, আসছে ইতালি থেকে। রাশিয়ার উরাল থেকে আসছে—ধূসর রংএর পাথর। উরালের তেরো মাইল দূরের আর একটি অঞ্চল থেকে আসছে—বুরানো মার্বল, প্রায় স্বচ্ছ, ঈষৎ গোলাপী, অলংকার তৈরির কাজে লাগে। রোম থেকে আসছে বাঘছাল মার্বল, ঠিক যেন বাঘের গায়ের রঙ। ইংল্যাণ্ড আর ইতালি থেকে আসছে অনিকস, আসছে অ্যালাবাস্টার।

পাঁচ হাজার কর্মী পাঁচ বছরে তৈরী করে দিল চোরবাগানের মল্লিকপ্রাসাদ মার্বল প্যালেস, পাথরের কাব্য, ওরিয়েন্টাল স্থাপত্যের অনন্যসাধারণ নিদর্শন। ষোল বছরের যুবক তখন একুশ বছরে পা রেখেছেন। ব্যক্তিত্ব তখন পরিপূর্ণ। কলকাতার সুধীসমাজে রাজেন্দ্র মল্লিক তখন মানী মানুষ। মার্বেল প্যালেসে তখন একাধারে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, জ্ঞানপীঠ, মিলনতীর্থ। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের ভাবের মিলন কেন্দ্র। ফরাসী দেশের বিখ্যাত আর্টডিলার মিরি ফরিনড্রকের কাছ থেকে ক্যাটালগ এসেছে, ইতালি মিদিচি ভেনাসের কাছ থেকে এল। সারা বিশ্বের বিখ্যাত কারুব্যবসায়ীরা এগিয়ে এলেন রাজেন-বাবুর মিউজিয়াম সাজিয়ে দিতে। মল্লিকমশাই জানতেন শিল্পের দুনিয়ায় দুর্লভ বস্তু কি কি। কার কৌলীন্য কত ওপরে!

বাগানের নাম রাখলেন নীলমণি নিকেতন। পিতার স্মৃতিমাখান সবুজ শিশির-ভেজা মাঠ, দুর্লভ গাছ, ফোয়ারা, জলাশয়। অবাক দর্শক এ কোথায় এলেন! জলে গা ভাসিয়ে আছে চীনের ম্যাণ্ডারিন হাঁস, ঘুরে বেড়াচ্ছে অস্ট্রিচ এমু। আর কয়েক পা এগোলেই নীল আকাশ ছোঁয়া স্তম্ভ। ছায়া দোলা বারান্দা, ইংরেজ বলবেন কুল কলোনেড। থমকে আছে মধ্যযুগ। ভাইকিং নাইট হাত বাড়িয়ে আলো দেখাচ্ছে অতিথিকে। বলছে চলে এস, আরো বিস্ময় তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে অন্তঃপুরে। গোল্ড ভিইন মার্বলের ওপর আলতো পা রেখে উঠে এস ওপরে। সিক্ত বসনা ভেনাস, সাইক জ্ঞানী মিনার্ভা, সোফোক্লিস,

ট্র্যাজিক মিউজ, ডেমোসথেনিস, এথেনা, হারানো সময়ের গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চলে এস রিসেপশান হলে।

মাথা তুলে সিলিংয়ের দিকে তাকাও। সারি সারি ঝুলছে ভেনিসের ঝাড় লণ্ঠন। আলোর সঙ্গে অল্প একটু অন্ধকার মিশিয়ে তরল আলোকে একটু ঘন করা হয়েছে। দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে স্নাইডিয়ান ভেনাস। পৃথিবীর কোনো আর্ট গ্যালারীতে এই ভেনাস তার উলঙ্গ সৌন্দর্যের জন্যে স্থান পায়নি। রাজেন্দ্র স্থান দিয়ে ছিলেন, 'আর্ট ফর আর্টস সেকের' জন্যে। আর একটি ভাস্কর্য দেখ, ভেনাস আর কিউপিড উঠে আসছে সাগর থেকে, দেখ মেডিচি ভেনাস, জানলার কাঁচে ভেনিসের শিল্পীদের হাতের এচিং, ঋতুচক্রের আবর্তন। মাথার ওপর ঝুলছে বেলজিয়ামের ঝাড়। দুস্প্রাপ্য তেতাল্লিশটি শিল্প নিদর্শন অভ্যর্থনা কক্ষ স্বাগতম জানাচ্ছে।

এইবার চলে এস রেড-ভিইনড মার্বল চেম্বারে। পাথরের মেঝেতে প্রকৃতির নিজের হাতের কাজ, লাল শীরা-উপশীরা ছড়িয়ে আছে এ দেয়াল থেকে ও দেয়ালে। প্রথমেই নজরে পড়বেন মহারানী ভিকটোরিয়া, কাঠের কাজ। রানীর করোনেশানের সময় ইংরেজশিল্প তৈরি করেছিলেন। রাজেন্দ্র হাতছাড়া হতে দিলেন না। এর কোনো দ্বিতীয় নেই। এই ঘরেই আছে তাং আর হান ডাইনাস্টির জোড়া জোড়া ফুলদানী। চীনের সবচেয়ে বড় একটি ফুলদানী এই ঘরেই আছে। ভারতের আর কোথাও এতবড় ফুলদানী নেই। এই কক্ষে প্রদর্শিত বস্তুর সংখ্যা বারোটি।

বিলিয়ার্ড ঘরের দেয়ালে ঝুলছে ফরাসী স্কুলের আটটি ছবি। এছাড়া আছে মার্বল, ব্রোঞ্জ ও পোর্সিলেনের তিরিশটি প্রদর্শনী। চিপেনডেলের ডিজাইনে দেয়াল জোড়া বিশাল আয়নায় সমগ্র ঘরটি ধরা আছে। ১৭০০ সালের ঠাকুর্দা-ঘড়ি গত আড়াইশো বছর ধরে সমানে গম্ভীর স্বরে সময় ঘোষণা করে চলেছে।

বিলিয়ার্ড ঘর ছেড়ে ভেতরের উঠোনে একটু থমকে দাঁড়াই। দরজার পাশে দেয়ালে ঘেঁসে মার্বলের বসার আসন। পাথরে পাথর

মেলানো কাজ। উঠোনটি এমন কায়দায় বসানো, যেখানেই দাঁড়ানো যাক সবদিক দেখা যাবে। দোতলার অলিন্দ থেকে উঠোনটি পরিপূর্ণ দৃশ্যমান। এক মাথায় প্রার্থনা-কক্ষ। চাতালের ওপর সিংহাসন। মেঝেতে পাথর বসাবার ডিজাইন রাজার নিজের করা। ভাস্কর্যে কোরিনথিয়ান ও ডোরিক ডিজাইনের মিশ্রণ যার ফলে চার্চ অভ্যন্তরের সাদৃশ্য এসেছে। সিলিং আর দেয়ালে ওয়াল্ডিও ঢংয়ের কাজ। নেভি ব্লু রঙে স্নিগ্ধ। ফরাসী ঝাড় পদ্মফুল হয়ে ঝুলছে। একজোড়া ফরাসী পরী হাওয়ায় ভাসছে। বারোটি শিল্পকীর্তি প্রার্থনা কক্ষের পবিত্রতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সূর্যদেবতা অ্যাপোলো একদিকে, অন্যদিকে শিকারী ডায়না। কিউপিড আসছে আলো হাতে। প্রাঙ্গণের সর্বত্র মার্বল আর ব্রোঞ্জ মূর্তির ছড়াছড়ি। এইখানেই আছেন ওয়ারেন হেস্টিংস, মোজেস, সোফোক্লিস। উনত্রিশটি শিল্পবস্তু বছরের পর বছর পরস্পর ভাববিনিময় করে চলেছে।

এরপর দক্ষিণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা যেতে পারে। উঠতে উঠতে ছবি দেখি। ইউরোপের শিল্পীদের মাস্টারপিস। ইতালি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ডাচ, বেলজিয়াম, চীন, ভারত। সব মিলিয়ে বর্তমান সংখ্যা ৩৮। প্রতি ধাপে ধাপে দাঁড়িয়ে আছে ব্রোঞ্জমূর্তি। উপরে উঠতে উঠতে চোখে পড়বে এইরকম ২১টি নিদর্শন। চোখে পড়বে রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের জীবনের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট কিছু মানুষের ছবি, লর্ড ভারবি, পশুপক্ষির ব্যাপারে যাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, স্যার জে ডবল্যু হগ রাজার জীবনশিল্পী। ডবল্যু ডবল্যু হান্টার দিনশ ওয়াচা, চিংহিং-এর আঁকা রাজার পোর্ট্রেট।

দোতলায় উঠে প্রথমেই যেতে পারি রুবেনস চেম্বারে। এই ঘরেই আছে রুবেনের আঁকা দুটি বিশাল ছবি, বিখ্যাত ছবি, ব্যাটল অফ অ্যামাজন, ম্যারেজ অফ সেন্ট ক্যাথারিন। কপি নয় অরিজিন্যাল। মোট ২৭টি ছবি আছে এই ঘরে। বৃটিশ, ইতালির, ফরাসী, স্প্যানিশ, বেলজিয়ান, ফ্লেমিশ শিল্পীদের ছবি। এই ঘরেই আছে র‍্যাফেল আর টিশিয়ানের ছবি। ২৫টি মার্বল, ব্রোঞ্জ ও পোর্সিলেনের নিদর্শন আছে।

দক্ষিণের বারান্দায় আছে ২৬টি প্রদর্শনী, পশ্চিমের বারান্দায় আছে ৩১টি, উত্তরের বারান্দায় ২০টি প্রদর্শনী। এরপর দরবার হল। দেয়ালে আছে ৫৪ খানা ছবি। মার্বল, ব্রোঞ্জ আর পোর্সিলেন মিলিয়ে ১৪টি প্রদর্শনী। ইংলিশম্যান লিখলেন—চোর বাগানের মল্লিক প্যালেস যেন—বার্লিংটন হাউস অফ ক্যালকাটা। বার্লিংটন ব্যাপারটা কি? লণ্ডনের বার্লিংটনে আছে রয়াল আকাদেমী অফ আর্টস।

হগসাহেব তুটো পাখি দিয়েছিলেন—রাজেন্দ্র মার্বেল প্যালেসে বসানো পক্ষী নিলয়। দেশ বিদেশের পাখি দাঁড়ে বসে সারাদিন কপচাচ্ছে। একপাশে বসে আছে পাখির রাজা, স্বর্গের পাখি বার্ডস অফ প্যারাডাইস, ইদানীং বিরল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের চিড়িয়াখানার মালিকদের সঙ্গে রাজার যোগাযোগ। এদেশের পশুপক্ষী ওদেশে, ওদেশের এদেশে। এই রসের তুই রসিক তাঁর বিশিষ্ট সুহৃদ—নবাব ওয়াজিদ, আলি শাহ্, লর্ড ডার্বি। পশুপক্ষীর ব্যাপারটাকে তিনি গবেষনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বিভিন্ন দেশের জীব বিভিন্ন আবহাওয়ার সঙ্গে কি'ভাবে মানিয়ে নিতে পারে শুরু হল বিশ্ব জুড়ে সেই গবেষণা। রাজেনবাবু হলেন উৎসাহী গবেষকদের অন্যতম। তাঁরই উৎসাহে হিমালয়ের ফেজান্ট গেল বিদেশে খাঁচা বন্দী হয়ে। অস্ট্রিচ এল মার্বেল প্যালেসের মাঠে। কলকাতার আজকের চিড়িয়াখানা তাঁরই উৎসাহে বদান্যতায় স্থাপিত। চিড়িয়াখানার গেট দিয়ে ঢুকলে সামনেই 'মল্লিকস হাউস,' ১৮৭০ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলসকে এইখানে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। এই 'মল্লিকস হাউস' রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের কাছে মধ্য-ভারতের অন্যতম প্রাচীন পশুশালার ঋণের নীরব স্বীকৃতি। উত্তর ভারতের পশুশালাও এমনি আর একজন মানুষের কাছে ঋণী—নবাব ওয়াজেদ আলি। লক্ষ্মৌ ছেড়ে সিপাহী বিদ্রোহের সময় চলে এসেছিলেন মেটেবুরুজে। রাজার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, প্রাণের টানে বাঁধা ছিলেন একই বিষয়ে। লণ্ডনের জুলজিক্যাল সোসাইটি ১৮৫৭ সালে উপহার দিলেন মেডাল। ১৮৬৩ সালে মেলবোর্ন থেকে স্বীকৃতি

হল—অ্যাক্লাইমেটাইজেসান সোসাইটি অফ ভিকটোরিয়ার অবৈতনিক সদস্য হলেন। ওই বছরই লণ্ডন জুলজিক্যাল সোসাইটির সদস্য হলেন, পেলেন ডিপ্লোমা। বেলজিয়ামের রয়াল জুলজিক্যাল সোসাইটি অফ এণ্টওয়ার্প তাঁর সাহচর্যের স্বীকৃতিতে কৃতজ্ঞতার চিঠি পাঠালেন।

পারিবারিক রেকর্ডে রাজার জীবনের কয়েকটি ঘটনা আণ্ডারলাইন করা আছে। সুবর্ণ বণিক সমাজের বিশিষ্ট একটি প্রথা কর্ণভেদ। কর্ণভেদ না হলে বিয়ের পিঁড়িতে বসা যাবে না। হীরামণির জীবৎকালেই রাজার কর্ণভেদ হয়েছিল, তারিখ ১৫ই মার্চ ১৮২৩ সাল। কত বছর আগের কথা। অনুষ্ঠানের দিন রাতে দেশী-বিদেশী অতিথির সামনে 'নাচ' পরিবেশন করেছিলেন বিখ্যাত নর্তকী যুগল—নিকি-আসরুন। ১৮২৩ সালেই রাজা রামমোহন রায়ের বাগানবাড়িতে নিকির নাচ দেখে ফ্যানি পার্ক তাঁর ট্র্যাভালাগে লিখেছিলেন—নিকি—দি ক্যাটালানি অফ দি ইস্ট।

আর একটি তারিখ ১৮২৯ সাল। হীরামণির শ্রাদ্ধের দিন। এস্টেট শ্রাদ্ধের খরচ অনুমোদন করেছিলেন, দু'লক্ষ টাকা। কলকাতা কেন গ্রাম গ্রামান্তর থেকে শ্রাদ্ধ বিদায়ের আশায় হাতে হারিকেন নিয়ে লাখ চারেক লোক এসেছিলেন চোরবাগানে। চার লক্ষ লোকের চাপে দক্ষযজ্ঞ। গেট ভেঙে পড়ল। আশপাশের দোকান লুট হয়ে গেল। ১৮৩০ সালের ইণ্ডিয়া গেজেট-এ ঘটনার বিবরণ আছে—নেটিভস গো বার্সার্ক। আর একটি তারিখ ১৮৩০ সাল। রাজার বিবাহ। বিয়ে করলেন তখনকার দিনের কলকাতার রথসচাইলড সেভেন ট্যাঙ্কের রূপলাল মল্লিকের মেয়েকে। বিয়েতে তখনকার দিনেই খরচ হল ৫০ হাজার টাকা।

ইংরেজের দালালী করে তখনকার দিনে অনেকেই রায়বাহাদুর হতেন। রাজেন্দ্র, রায়বাহাদুর হয়েছিলেন—দিলবাহাদুর বলে। কলকাতার তৎকালীন কমিশনার অফ পুলিশ এস হগ বাংলার গভার্নারকে লিখছেন:

এই সেই রায় রাজেন্দ্র মল্লিক যিনি প্রতিদিন শ-পাঁচেক, সময় সময়

হাজার মানুষকে অন্ন বিতরণ করে জলস্পর্শ করেন। ১৮৬৫ সালের দুর্ভিক্ষে গ্রামের মানুষ যখন হা অন্ন হা অন্ন করে শহরের পথেঘাটে কুকুর বেড়ালের মত মরতে লাগল, রাজেনবাবু সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণকার্যে নেমে পড়লেন। তাঁর চেষ্টাতেই বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। মানুষ দুমুঠো খেতে পেল। একজিকিউটিভ যেমিন রিলিফ কমিটি যখন সিদ্ধান্ত নিলেন শহরকে মহামারীর হাত থেকে রক্ষার জন্যে কলকাতার পথেঘাটে পড়ে থাকা প্রপীড়িত মানুষকে অন্নছত্র বন্ধ করে, চিৎপুর ক্যাম্পে সরিয়ে নিতে হবে, রাজেনবাবু এগিয়ে এলেন। বললেন ঠিক আছে অন্নছত্র বন্ধ করে দিচ্ছি। বদলে এদের খাওয়াবার জন্যে কমিটির হাতে প্রতিদিন ১০০টা করে টাকা দেবো। রাজেনবাবুর চেষ্টাতেই মানুষও বাঁচল, কলকাতাও বাঁচল।

দুর্গতদের চিকিৎসার জন্যে রাজেনবাবু কলুটোলায় তাঁর সদ্য নির্মিত দুটি বড় গোডাউন ছেড়ে দিলেন। যা ভাড়া দিলে প্রত্যেকটা থেকে মাসে ১৬০০ টাকা ভাড়া পেতেন। টিভোলি গার্ডেনের বাড়ি আর জমিও এই একই উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিলেন।

ত্রাণকার্য বন্ধ হবার পর দুর্গতরা কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেও তিন হাজার অনাথ শিশু পড়ে থাকবে। রাজা বললেন অনাথ আশ্রমের জন্যে মাসে মাসে একশো টাকা চাঁদা দোবো। এমন একটি মানুষ যিনি সারা দেশের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারেন, যিনি দুঃসময়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন তিনি সম্মানীয়। তাঁর সম্মানের স্বীকৃতি চাই :

১৮৭৭ সালের পয়লা জানুয়ারী কলকাতায় দরবার হল। মহারানী ভিকটোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী হলেন। রাজেন্দ্র পেলেন সম্মানসূচক খেতাব—'রায়বাহাদুর'। পরের বছরই ভাইসরয় লিটন সাহেব তুলে দিলেন তাঁর হাতে সনদ এবং খিলাত নামের আগে পরিয়ে দিলেন 'রাজা বাহাদুর' খেতাব। খিলাত হল একটি হীরা বসানো আঙটি।

ইণ্ডিয়ান গেজেট কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের লাইন উদ্ধৃত করলেন :

ট্রু টু দি কিণ্ডেড পয়ন্ট অফ হেভন এণ্ড আর্থ। বললেন—এ পারফেকট ম্যান নোবলি প্ল্যাণ্ড।

রাজা বাহাদুর খেতাব দিয়ে ইংরেজ কিন্তু তাঁর স্বকীয়তা, বিশিষ্টতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা হরণ করে বশংবদ বাঙালী বড়লোক তৈরি করতে পারেন নি। তাঁর তেজস্বীতার কথা ইংরেজ সেদিনই জেনে ছিলেন, যেদিন রাজ খেতাবহীন রাজেন্দ্র হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নস পিককের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। পিকক সাহেব চরিত্রহীনতার অপরাধে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বার থেকে বহিষ্কৃত করে দিয়েছিলেন। রাজা রাজেন্দ্র রুখে দাঁড়ালেন। জনমত তৈরি করলেন। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মনোমোহন ঘোষ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, টেকচাঁদ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর আর রাজেন্দ্র মল্লিক, মাইকেলের পক্ষ নিয়ে জয়েন্ট পিটিশান ছাড়লেন, লিখলেন—এ জেন্টলম্যান অফ গুড এণ্ড রেসপেকটেবল ক্যারেকটার এণ্ড এবিলিটি। স্যার পিককের ভীমরতি হয়েছে। পিকক সুর সুর করে আদেশ প্রত্যাহার করলেন। মাইকেল ফিরে গেলেন বারে।

১৮৫৬ সালে পরিবারের এক পূর্বপুরুষের সমাজ সংস্কারের বিরোধিতা করার প্রায়শ্চিত্য করলেন। পিতৃব্য বৈষ্ণবদাস রাজা রামমোহনের সতীদাহের বিরোধিতা করেছিলেন। রাজেন্দ্র বিদ্যাসাগরের-উইডো রিম্যারেজ এ্যাক্ট সমর্থন করে পাশ করিয়ে দিলেন। রাজেন মল্লিক তখন শুধু শ্বেতপাথর প্রাসাদের ধনী নন, সমাজ সংস্কারক, সুপণ্ডিত সুসংস্কৃত স্বদেশী মানুষ। টিভোলী পার্কে তাঁরই বাড়িতে দাদাভাই নওরোজি দ্বিতীয় কংগ্রেস ডাকলেন। ক্যালকাটা গেজেটের ১৮৬৭ সালের ২৩শে জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হল রাজেন্দ্র প্রশস্তি—মিউনিফিসেনস অফ রাজেন্দ্র মল্লিক।

লর্ড নর্থব্রুক ছিলেন রাজার বন্ধু। ১৮৭৫ সালে তাঁকে সরকারের ফিনানস ও লাইব্রেরী সাব কমিটির সভ্য করে নিলেন। এর আগেই লর্ড মেও তাঁকে ভারতীয় যাদুঘরের অন্যতম অছি করে নিয়েছিলেন। যাদুঘরে রাজেনবাবুর অনেক দান আছে। রাজা বাহাদুর হবার পর

বিশেষ অধিকার বলে আর্মস অ্যাক্ট বহির্ভূত আরো বন্দুক গোলাগুলি রাখার অনুমতি পেলেন। গড়ে উঠল পারিবারিক অস্ত্রশালা। অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশানের বিশেষ সভ্য হলেন। কলকাতা করপোরেশানকে জমি ছেড়ে দিলেন রাস্তা করার জন্যে, আজকের রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট। ডেঙ্গু আর ম্যালেরিয়ার সঙ্গে লড়াই করার জন্যে ডাক্তারদের সমবেত করলেন।

এদিকে শিক্ষায় দীক্ষায়, সংগীতে, সংস্কৃতিতে, শিল্পবস্তুতে, পরিবারের সভ্য সংখ্যায় মল্লিকবাড়ি ক্রমশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। একে একে বংশধররা আসছেন—দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র, যোগেন্দ্র, গিরীন্দ্র, সুরেন্দ্র, মণীন্দ্র রাজা ভেবেছিলেন ছ ছেলে, পরিব্যাপ্ত কীর্তি রেখে একদিন চলে যেতে পারবেন। কিন্তু মৃত্যু তার আগেই পাখা মুড়ে নামল। যোগেন্দ্র শৈশবেই চলে গেল, গিরীন্দ্র সুরেন্দ্র তারাও চলে গেল। পারিবারিক আদর্শ আর কালচারের স্বার্থে মহেন্দ্রকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। মহেন্দ্রের বংশধররা আজ অবলুপ্ত। বড় দেবেন্দ্র মেধা পেলেন, পিতার সমস্ত গুণ পেলেন, পেলেন না রোগমুক্ত শরীর।

(৮)

আটষট্টি বছর বয়স হল। সময় তো আর ছেড়ে কথা বলবে না। ভোগেই থাকো আর ত্যাগেই থাকো, কীর্তিমান হও কি কীর্তিনাশা হও, সময়ের কর্কশ হাত অনবরতই ক্ষয়ের হাত বুলিয়ে চলেছে। টাইম ইউ ওল্ড জিপসি ম্যান। তোমরা আমাকে এই ঘরে রাখো। জানলাটা খুলে দাও, চোখের সামনে থাক আমার মন্দির যেখানে আছেন আমার জগৎপ্রভু জগন্নাথ। তোমরা যাও, কর্তব্যের সংসার, কর্মের সংসার তোমাদের ডাকছে। আমাকে একপাশে পড়ে থাকতে দাও। কর্ম আমাকে ত্যাগ করেছে। শরীর দিয়েছে নোটিশ। পা দুটো ফুলে উঠেছে। উঠতে পারি না। চলতে পারি না। তোমরা চালিয়ে যাও। এক রাজেন্দ্র যাবে আর এক রাজেন্দ্র আসবে এই তো জগতের নিয়ম। আমি গভীর রাতে শুনতে পাই, আমার পাইপিং প্যান, রিসেপশান হলে

তার বাঁশি বাজাচ্ছে। বড় করুণ সুর। পৃথিবীর হৃদয় থেকে ওই সুর আসছে—দুঃখ, বেদনা, বিচ্ছেদ, ভালবাসা, প্রেম, দয়া, নিষ্ঠুরতা, বঞ্চনা সব একপাত্রে ঢেলে নির্যাস তৈরি করেছো ঈশ্বর। তাই পাত্র ভরে পান করে আমরা নেশায় ঢলে পড়েছি। এই হাসছি, এই কাঁদছি। আমার আমার বলে চিৎকার করছি। জোড়াসাঁকোর আর এক কীর্তিমান কবি এই কথাই লিখবেন :

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে
কুসুম ঝরিয়া যায় কুসুম ফোটে।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর এল. এল. ডি. সি. আই. ই শোক প্রস্তাবে বললেন—

I can not on the present occasion forget another name. It is that of Rajah Rajendro Mullick Bahadur, who died only the other day (14-4-87). A more accomplished and finished gentleman you could not find in Calcutta. His liberality was princely, and in losing him the citizens of Calcutta have lost a most benevolent worthy member of society. The poor of Calcutta have lost a father.

হিরেনবাবু বললেন—জুতোটা খুলে আসুন। এই মার্বেলের মেঝে জুতো সহ্য করতে পারে না। সারা বাড়িতে পিয়ানোর সুর ছড়িয়ে পড়ছে। কে বাজাচ্ছেন হিরেনবাবু? আমার বাবা। এই সেই ঘর যে ঘরে নিকি আর আসরুন একদিন নাচতো। সেদিন রবিশঙ্কর বাজিয়ে গেলেন। আসুন এই হুইসপারিং চেয়ারে বসি। মল্লিকবাড়ির বর্তমান বংশধরকে হঠাৎ প্রশ্ন করলুম—এই সব ছেড়ে যেতে আপনার কষ্ট হবে না? কবি হিরেন্দ্র মল্লিক একটু হাসলেন। জীবন সবে ভরা যৌবনে টলটল করছে। এখনই এ প্রশ্ন কেন? শ্যাণ্ডেলিয়ারের দিকে তাকিয়ে বললেন—একটুও না—মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান।

২

'আমি তাকে ভালবাসি
জানি আমার এ প্রেম
কোন দিন পূর্ণ হবে না
কারণ একদিন তিলে তিলে
আমি মৃত্যুকে বরণ করে নেব
আমার হত্যাকারী সেই 'ক্যাডমিয়াম'
সে আমাকে দেবে না সময়
তার কি এসে যায়, যদিও
আমি তাকে সুগভীর ভালবাসি'

কবিতাটি পাঠ শেষ করে, চোখ তুলে তাকালেন পার্লামেণ্টের জনৈক প্রবীণ সদস্য। সভা তখন স্তব্ধ। চোখের কোণে হয়ত অনেকেরই জল চিক চিক করছে। প্রধানমন্ত্রী 'এই সাকুসাতো' উঠে দাঁড়ালেন। চোখের কোণের জল-বিন্দু একটি দুটি ফোঁটায় গাল বেয়ে বেয়ে নামছে। রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি সভার সদস্যদের জানালেন—'তাকাকোর পিতা মাতাকে আমি জানাতে চাই, আমার সরকার এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে ভবিষ্যতে জাপানে ঠিক এমনি ঘটনা যেন আর না ঘটে।' একটি সাদা সিল্কের রুমালে চোখ মুছলেন প্রধানমন্ত্রী সাতো। পার্লামেণ্ট ভবনের বাইরের শিল্প সমৃদ্ধ জাপানের রাজপথ তখন অতি ব্যস্ত। মানুষের সুখ-দুঃখের খবর রাখার মত অবসর নেই মানুষের জীবনে। ব্যস্ত পৃথিবীতে তাকাকোর করুণ কাহিনী হারিয়ে যাবে। পার্লামেণ্টের স্তব্ধ হল ঘরে একটি সাময়িক শোকের ছায়া, আকাশের বুকে একখণ্ড কালো মেঘের মত, এক পশলা বৃষ্টি নামিয়েই সরে যাবে।

রূপের জগৎ জাপানের পার্কে পার্কে তখন চেরী ফুল আগুন

ছড়াচ্ছে। ক্রাইসেন্থিয়ামের সমারোহে মানুষ মুগ্ধ। কে তাকাকো? কিসেরই বা কবিতা? কারই বা ভালবাসা? কিসের জন্য এই চোখের জল। প্রধানমন্ত্রী সাতোর প্রতিজ্ঞা। কেউ বা মাথা ঘামাচ্ছে। সকলেই ব্যস্ত। নিশান গাড়ী ছুটিয়ে চলেছেন ব্যস্ত শিল্পপতি। একটি তরুণ আর তরুণী পার্কের নিভৃতে নিজেদের খুবই কাছাকাছি। বিদেশী ট্যুরিস্ট ছবি তোলায় ব্যস্ত।

জাপানের এই অতি চেনা জগৎ, এর আকর্ষণ কাটিয়ে তাকাকো নামের একটি সুন্দরী তরুণী অকালে বিদায় নিয়েছে। তার বাবার চোখে জল, মা প্রায় পাগল। এমন সুন্দর মেয়ে, তাঁদের এমন কর্তব্যপরায়ণ বুদ্ধিমান মেয়ে কেন হঠাৎ আত্মহত্যা করল। কে জবাব দেবে? তাকাকোই হয়ত পারত এর জবাব দিতে কিন্তু সে তো বহু দূরে, জগৎ পারাবারের ওপারে। রঙীন কিমোনো ছড়ানো তার সুন্দর দেহ এখন কাঠের কফীনে, পৃথিবীর অন্ধকার হাম শীতল গহ্বরে।

অথচ এই সেদিন ব্যাগ নাচাতে নাচাতে একটি সুন্দর রঙীন প্রজাপতির মত তাকাকো সকলকে সুপ্রভাত জানিয়ে, সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে, তার প্রথম কাজে যোগ দিতে গিয়েছিল। তার মুখে চোখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব, স্বাবলম্বনের আনন্দ। তার ব্যাগের মধ্যে সেই নিয়োগ পত্র, সেখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে—ইউ হ্যাভ বিন এপয়েণ্টেড···ইত্যাদি। টোকিয়োর কাছে গুমাতে একটি দস্তা-গালানোর কারখানায় সে চাকরী পেয়েছে। চারিদিকে দস্তার পাত থাক থাক সাজানো। অসংখ্য মেয়ের ভীড়ে তাকাকো হারিয়ে গেল। কাজ আর কাজ। স্মেল্টারে ধাতুর পাত তরল হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত আবর্জনা একদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে শতকরা একশোভাগ ধাতুর পাত জমা হচ্ছে। গাড়ীতে ধাতুর পাত বোঝাই হচ্ছে। এই দুর্লভ ধাতু এইবার চলে যাবে কলে কারখানায়, জাহাজে চেপে বিদেশে, ভারতবর্ষে। তাকাকো কবিতা লিখতে ভালবাসে। এই কারখানায় ঘামে আর পরিশ্রমে যে কবিতা লেখা হচ্ছে তা হল জীবনের কবিতা, জীবিকার কবিতা, মানুষের বেঁচে থাকার জীবন্ত কবিতা। কাজের

শেষে, কারখানায় ছুটির বাঁশী বাজলে, ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতির মত, স্কার্ট পরা এই সব মেয়ের দল যখন রাস্তায় নেমে আসে, বাসস্ট্যাণ্ডে ভীড় করে তখন হয়ত সে দৃশ্য দেখে নেহাত অকবিও কাব্য রসিক হয়ে উঠবেন।

পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ জাপান, এসিয়ার আমেরিকা। সেখানে প্রতিটি মানুষের জীবনে এসেছে স্বাচ্ছন্দ আর প্রাচুর্য। প্রাণ চঞ্চল, কর্ম চঞ্চল এই দেশ। ঝক্ ঝকে গাড়ী। বাগান ঘেরা, ঝর্ণা ঝরা ছবির মত বাড়ি। টেলিভিশান। ভোগের সামগ্রীর ছড়াছড়ি। সারাদিন স্মেল্টারের লাল আগুনে চোখ ঝলসেছে, লাল আপেলের মত গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরেছে। কিন্তু স্নিগ্ধ রাতের চন্দ্রাতাপের তলায়, আলোক উজ্জ্বল জাপানের আর এক চেহারা। ঝকঝকে রাস্তায় ভ্রমণার্থীর দল। রেস্তোরাঁয় নাচ গান আর হুল্লোড়। বাড়িতে বাড়িতে টি, ভি। এই সময়টুকুই তাকাকোর নিজের। এই সময় সে কবিতা লেখে। সে পড়ে, গান গায়। মাঝে মাঝে রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে সে উদাস হয়ে যেতে চায়। তার লেখার খাতায় বারে বারে একটি লাইন লেখা হয়—আমি তাকে ভালবাসি। কে সেই মানুষ। না একি তার জীবনকে ভালবাসা। 'ভালবাসি, ভালবাসি, এই সুরে কাছে দূরে বাজায় বাঁশী।'

১৯৫৯ সালে তাকাকোর চাকরী জীবনের শুরু। ১৯৫১ সালে তাকাকো চাকরী পেল তোহো জিঙ্ক কোম্পানীতে। এবারের কাজ হল ক্যাডমিয়ামের বাট থেকে চেঁচে চেঁচে ক্যাডমিয়াম বের করা। সোনালী ধাতু। যার আস্তরণে সামান্য লোহার পাত হয়ে উঠে স্বর্ণ সুন্দর। সারাদিন ধরে তাকাকো এক একটি বাট থেকে ক্যাডমিয়াম চেঁচে চেঁচে জমা করে। সেই এক ঘেঁয়ে ক্লান্তিকর কাজের শেষে যখন ছুটি মেলে তখন তাকাকোর অন্য জীবন শুরু হয়। সে জীবনে আশা আকাঙ্খা আছে, কল্পনার পাখা মেলে ভাবের রাজ্যে উড়ে চলা। তখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, বল্গাহীন, প্রাণ চঞ্চল। কিন্তু কয়েকদিনে তার একি হয়েছে? অসহ্য ক্লান্তিতে যেন শরীর ভেঙে আসছে।

মাথা টিপ টিপ করছে, চোখ খুলতে পারছে না। গা গুলোচ্ছে। কেন সে ঘরের কোণে মাথায় হাত রেখে বসে আছে। টেবলে বই খোলা। সাদা খাতায় সে একটিও লাইন পাততে পারেনি। এমন নিষ্ফলা বন্ধ্যা সন্ধ্যা কি তার জীবনে আর এসেছে।

ডাক্তারবাবু প্রবীণ। সব শুনলেন। এমন সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। কিন্তু কথা বলতে বলতে কেমন যেন উদাসীন হয়ে যাচ্ছে, যেন কোন রাজ্যে চলে যাচ্ছে। পরীক্ষা করলেন। ধীরে ধীরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ব্লাড প্রেসার? না নর্মাল। চোখের কোন গোলযোগ? না চোখ তো ঠিক আছে। বদহজম, ইনডাইজেসান ফ্ল্যাটুলেন্স? হতে পারে। কিম্বা অন্য কিছু? এই বয়সের মেয়ে, বলা যায় না কোন বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে কোন দুর্বল মুহূর্তে, কোন নিবীড় দৈহিক সম্পর্কের অনিবার্য পরিণতি নয় তো! 'হ্যা মা, তুমি কি কোন'—তাকাকো চমকে উঠলো। না না সে রকম কোন সম্ভাবনাই নেই। আমি এখনও কুমারী। প্রবীণ বৈদ্য চিন্তায় ডুবে গেলেন। ভেষজ বিজ্ঞানের মহা-সমুদ্রে ডুবুরীর মত ওষুধের মণি মুক্তো হাতে উঠে এলেন। তাহলে তুমি কিছু এ্যান্টাসিড খাও, একটা দুটো ভিটামিন পিলস। আর পরিশ্রমের তুলনায় পুষ্টী হচ্ছে না তোমার। তুমি শোবার আগে এককাপ মল্ট এ্যাক্সট্রাক্ট মেশানো দুধ খাবে।

তাকাকো বেরিয়ে এল রাস্তায়, হাতে প্রেসক্রিপসান। উদিত সূর্যের দেশ জাপানের আকাশে তখন সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। চেরী গাছের পাতায় পাতায় সেই অস্তমিত সূর্যের লালের স্পর্শ লেগেছে। পৃথিবী এত সুন্দর কিন্তু তাকাকোর কাছে সব কিছুই এখন বিষণ্ণ, অর্থহীন। তার পৃথিবীর রঙ ক্রমশই পাল্টাচ্ছে।

তাকাকোর মা অধীর উদ্বেগে জিজ্ঞেস করলেন—'ডাক্তার বাবু কি বল্লেন?' তাকাকোর সংক্ষিপ্ত উত্তর—'মাথা আর মুণ্ডু'। মার মনে আঘাত লাগল, তিনি যে উদ্বিগ্ন—'বল না কি বল্লেন।' তাকাকো যেন ক্ষেপে গেল—'আমাকে বিরক্ত কোরোনা, বিরক্ত কোরোনা'। সত্যিই সে যেন উন্মাদ হয়ে গেছে, হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল—টেবিলের

উপর থেকে টেবল ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল সামনের দেয়ালে। প্রেসক্রিপসানের কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিলো। আছড়ে পড়ল বিছানার উপর। সে কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে।

সমস্ত বাড়ীতে বিষাদের ছায়া নামল। হে ঈশ্বর, তুমি একি করলে! তাকাকোর মা সেদিন সারারাত বুদ্ধের সামনে নতজানু হয়ে মেয়ের আরোগ্য প্রার্থনা করলেন। মেয়ে সেই যে বিছানায় আছড়ে পড়েছে তাকে আর কিছুতেই ওঠানো গেল না। খাবার ঘরে, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল, বাতিদানে, বাতি নিভু নিভু হয়ে এল। তাকাকোর অশান্ত মনকে শান্ত করা গেল না। কি যে তার হয়েছে, কি যে তার বেদনা; কেউ জানতে পারল না। অব্যক্ত সব কিছুই কেমন যেন বিস্ময়কর। কি হয়েছে তাকাকোর! সে কি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছে! না কি কর্মস্থলে কোন আশা ভঙ্গের কারণ ঘটেছে। কিন্তু মানুষের জীবনে সাফল্য, অসাফল্য, জয় পরাজয়, সুখ অথবা দুঃখ চাকার মত ঘুরে ঘুরে আসে। এই তো জগৎ। হতাশায় এমন উন্মাদ হয়ে যাবার মানে কি। কে বোঝাবে তাকে? কে একটু সান্ত্বনা দেবে! পৃথিবীতে মার চেয়ে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ কে আছে। সেই মাকেই যখন সহ্য করতে পারছে না সে, তখন অন্য বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের তো কোন কথাই চলে না। ভোর হচ্ছে ধীরে ধীরে। দূরে মাউণ্ট ফুজি আকাশের গায়ে ঝাপসা হয়ে আছে। ঘন নীল আকাশের গায়ে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ সূর্যের রঙ চুরি করে লাল হয়েছে। বাগানের ঘাসে শিশিরের বিন্দু রাতের কোন গভীর বেদনার যেন নিরব সাক্ষী। 'তাকাকো' 'তাকাকো', কোন সাড়া নেই। ঘরের দরজা ভেজানো। মা আবার ডাকলেন, 'তাকাকো।' চারিদিকে ঝলমলে সূর্য। কাল সারারাত মেয়ে অভুক্ত। এবার সে উঠুক। মুখ ধুয়ে সে কিছু খেয়ে নিক। একে শরীর খারাপ, না খেলে আরো খারাপ হবে। 'তাকাকো ওঠো তুমি, আর কতক্ষণ ঘুমোবে?' যখন কিছুতেই সাড়া পাওয়া গেল না তখন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লেন। 'কিন্তু একি। ঘর খালি। বিছানায় কেউ নেই। বিছানার উপর পড়ে আছে তাকাকোর রাতের পোষাক। এই ভোরে,

রাত শেষ হতে না হতেই সে কোথায় গেল। কোথায়ই বা যেতে পারে।

স্বামীকে বললেন—'আমার বাপু ভাল মনে হচ্ছে না, তুমি একবার দেখো। মেয়েটা এই সাত সকালে কিছু না বলেই কোথায় চলে গেল। তাকাকোর বাবা প্রৌঢ় যোশিয়ো, চিন্তিত হলেন। পাইপ টানতে ভুলে গেলেন। নিবে গেল পাইপ। সেই নিভন্ত পাইপ দাঁতে চেপে ধরেই বাগানে তু'বার পায়চারি করলেন। বৃদ্ধ যোশিয়ো বেরিয়ে পড়লেন মেয়ের খোঁজে। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গাতেই খোঁজ করলেন। না কোথাও নেই সে। সে অফিসে যায়নি। সে লাইব্রেরীতে যায়নি। বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কেউ বলতে পারল না তাকাকো কোথায়। ক্লান্ত যোশিয়ো বাড়ি ফিরলেন। এর মধ্যে নিশ্চয়ই সে ফিরেছে। হয়ত বাড়ি ফিরে দেখবেন সেই চির পরিচিত দৃশ্য। তার লেখার টেবিলে বসে তাকাকো একমনে লিখছে।

ফেরেনি, এখনও ফেরেনি তাহলে। যোশিয়ো ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লেন। মেয়েকে বড় ভালবাসতেন। সেই ছোট্ট শিশু তাকাকো। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল। চক চকে তুটো চোখ। যেন একটা ডল পুতুল। সারাদিন তার বকবকানিতে বাড়ি মুখর হয়ে থাকত। শূন্য ঘরে যোশিয়ো মাথায় হাত রেখে অন্ধকারেই বসে রইলেন। বাইরে করিডরে ঘড়ি টিক টিক করছে। সময় যেন একটি হাই-হিল জুতো পরা মেয়ের মত অনবরত পায়চারি করছে। রাত তখন কটা হবে তিনটে। দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঐ, ঐ এসেছে তাকাকো। যোশিয়ো তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। বলতে যাচ্ছিলেন—'এতক্ষণ কোথায় ছিলি মা?' কিন্তু এ কে! চমকে উঠলেন যোশিয়ো। পুরো ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিশ অফিসার।

'সেই ছুটন্ত ট্রেন। টোকিও ষ্টেশন থেকে ছেড়ে হু-হু শব্দে চলেছে উত্তর মুখো। টেলিগ্রাফ পোষ্টগুলো উল্টো দিকে দৌড়োচ্ছে। শহর গ্রাম, গ্রাম শহর। জানালায় টেলিভিশন ছবির মত আসছে যাচ্ছে। মেয়েটির চোখে মুখে কেমন যেন উদাস দৃষ্টি। সে যেন এ জগতে নেই।

দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনে। হাওয়ায় তার স্কার্ট উড়ছে, চুল উড়ছে। আমরা ভাবতেও পারিনি যে এমন ঘটনাও ঘটতে পারে। হঠাৎ সে লাফিয়ে পড়ল, সেই প্রচণ্ড গতিশীল ট্রেন থেকে। তারপর তারপর…'

যোশিয়ো চোখ ঢাকলেন আতঙ্কে। একি শুনছেন তিনি। একি দেখছেন চোখের সামনে। ছিন্ন ভিন্ন থেঁতলানো ক্ষত বিক্ষত এই দেহ তারই প্রিয় কন্যা তাকাকোর, সেই ছোট্ট তাকাকো। সেই কত স্বপ্ন, কত স্মৃতি, যেন অনেক অনেক চরিত্র, যেন অপসৃয়মান হাজার হাজার পায়ের শব্দ। তারপর অন্ধকার। শোক যেন পাথর হয়ে গেছে। শবাধারে তাকাকো এখন ঐ অন্ধকার মাটির তলায় কবরের নিশ্চিন্ত নিদ্রায়। সমস্ত বেদনা আর যন্ত্রণার কি সহজ পরিণতি। আত্মহত্যা? কেন এই আত্ম হনন?

প্রতিবেশীরা এলেন সমবেদনা জানাতে। তাঁরা দূর থেকে যেমন দেখছেন, বিভ্রান্ত, উদভ্রান্ত তাকাকো। সিদ্ধান্ত তাদের সোজা রাস্তায় চলেছে। মেয়ে তো পাগল হয়ে গিয়েছিল ভাই। কোন উন্মাদ আশ্রমেই রাখা উচিত ছিল। কিম্বা আহা কাকে ভাল বেসেছিল, মন দিয়েছিল না জেনে শুনে, আর তারই তো এই পরিণতি। প্রতিবেশী-দের সমবেদনা নানা ভাষায় নানা ধারায় প্রবাহিত। সময় সমস্ত বেদনার উপর একদিন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়। তাকাকোর বাবা কিন্তু শান্তি পেলেন না। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে এই মৃত্যুর রহস্য।

তাকাকোর সমস্ত পাণ্ডুলিপি উল্টে-পাল্টে লাইনে লাইনে পড়তে শুরু করলেন। হঠাৎ একদিন একটি নোটবুকে আবিষ্কার করলেন কয়েকটি লাইন—

'আমার মনে হচ্ছে তাল তাল লোহা আর বালি যেন আমার সারা গা বেয়ে উঠছে। তাকাকো লিখছে—ক্যাডমিয়াম চাঁছার কাজ নেবার আগে পর্যন্ত কখনও এরকম অনুভূতি আমার হয়নি।

কি করুণ বিবৃতি? বোঝা গেল, কোন এক রাতে লেখা এই

কয়েকটি লাইন থেকে বোঝা গেল—হত্যাকারী কে? হত্যাকারী সেই স্বর্ণময় ধাতু ক্যাডমিয়াম। বিশেষজ্ঞরা বললেন—তাকাকো নিশ্চয়ই অত্যন্ত বেশী মাত্রায় ক্যাডমিয়াম গুড়ো শুঁকে ফেলেছে। তারা বললেন কবর থেকে বের করা হোক তাকাকোর দেহ। পোষ্টমর্টেম করে দেখা হোক মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি?

তাকাকোর বাবা সাংবাদিকদের বললেন—'সেদিন আমার জীবনে আমি সবচেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম—জানতাম ক্যাডমিয়ামই হয়ত মৃত্যুর কারণ, কিন্তু কি সাংঘাতিক কথা, নিজের মেয়েকে কবর থেকে খুঁড়ে তোলা?'

সমাহিত করার ১৫ মাস পরে এই বছরের শুরুতে তাকাকোর কবর খুলে, তার গলিত-বিকৃত দেহকে পোষ্টমর্টেম-এর টেবিলে শোয়ানো হলো। একদল ডাক্তার তার কিডনী পরীক্ষা করে দেখলেন। সাংঘাতিক ব্যাপার—তার কিডনী থেকে ২২, ৩০০ ভাগ ক্যাডমিয়াম গুঁড়ো বেরোলো। একজন সাধারণ সমবয়সী জাপানীর মূত্রাশয়ে যত ভাগ আছে তার চেয়ে অন্তত ১০ গুণ বেশী। ওকায়ামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জান কোবায়াশি বললেন—'তাকাকোর মূত্রাশয়ে ক্যাডমিয়ামের পরিমাণ বোধহয় বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এর আগে এত ক্যাডমিয়াম কারুর কিডনী থেকে বোধকরি আর পাওয়া যায়নি।'

এই ক্যাডমিয়াম মানুষের স্নায়ুতে এক অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেহের হাড়ের কাঠামোকে দুর্বল করে দেয়। এই মারাত্মক ক্যাডমিয়াম অতিদ্রুত তাকাকোর স্নায়ুতন্ত্রকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে ধারাল ছুরির মতো, তার হাড়ের সমস্ত মজ্জা শোষণ করে নিয়েছে। সেই অদৃশ্য হত্যাকারী তার নিষ্ঠুর হাতে একটি কুসুম-সুন্দর মেয়ের জীবনকে সংক্ষিপ্ত করেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছটফট করেছে। তার মনে হয়েছে তাল তাল লোহা আর রাশি রাশি বালি সারা গায়ে কাঁকড়া বিছের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার স্মৃতি আচ্ছন্ন হয়েছে, তার চিন্তা শক্তি ক্রমশ ধোঁয়াটে হয়েছে। তারপর একদিন অতর্কিতে সে লাফিয়ে পড়েছে ছুটন্ত ট্রেন থেকে। পৃথিবীর মাটিতে সে যন্ত্রণা জুড়োতে চেয়েছে।

এখন যেন চোখ বুজলে স্পষ্ট মনে হয়, তার সেই ভাসা ভাসা চোখ আর পুতুলের মতো মুখ। চোখের কোণ বেয়ে মুক্তোর বিন্দুর মতো জল নামছে, সে লিখছে তার নিজেরই সমাধি ফলক—

'আমার এ প্রেম জানি
পূর্ণ হবে না কোনদিন
আমি জানি একদিন
ঝরে যাবো নিশ্চিত
এ মৃত্যু আমার হবে,
তারই হাতে সেই সুবর্ণ ধাতু
ক্যাডমিয়াম ক্যাডমিয়াম'

৩

কি তোমার নাম ?

আজ্ঞে জাঁহাপনা অধীনের নাম ওস্তাদ ঈশা মহম্মদ।

নাকের কাছ থেকে লাল বসরাই গোলাপটি বাঁ দিকে হেলিয়ে স্ফটিকের পাত্র থেকে একটি বরফ শীতল কাবুলী আঙুর মুখে আলগোছে ফেলে সম্রাট বললেন—

বাঃ বেশ তোমার নাম, ওস্তাদ ঈশা মহম্মদ।

ঈশা আর একবার কুর্নিশ করে বলল—আমার সৌভাগ্য জাঁহাপনা, আমার নাম ভারত ঈশ্বরের পছন্দ হয়েছে।

সকালের ঝিলমিলে সোনা রোদ জাফরীর জালির ফাঁক দিয়ে মোগল সম্রাটের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে। সম্রাট সাজাহান দূর আকাশে চোখ রেখে নাকের কাছে অন্যমনস্ক গোলাপ ফুলটি নাচাতে নাচাতে আপন মনেই বললেন—পারস্য, পারস্য, সুন্দর তোমার দেশ ওস্তাদ, কি কি যেন বললে সেই শহরটির নাম—শিরাজ। তুমি শিল্পী, তোমার দেশ শিল্পের দেশ। সম্রাট হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন —অনেকটা যেন বাদশাহী ফরমান জারি করলেন—

ঈশা মহম্মদ তুমি আজ থেকে নিযুক্ত হলে মোগল বাদশার স্থপতি। সুদূর পারস্যে বসে তুমি যে বিদ্যা শিখেছ তাই দিয়ে তুমি আমার সাম্রাজ্যকে তিল তিল করে সাজিয়ে তুলবে। আমি যখন এক রণক্ষেত্র থেকে আর এক রণক্ষেত্রে খোলা তলোয়ার হাতে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ব তখন ছুটে আসব তোমার নিজের হাতে সাজানো আমার সুন্দর রাজধানীতে। ঈশা মহম্মদ, জীবন তো পদ্মপাতার জলের মতোই চির-চঞ্চল কিন্তু তার কীর্তি, তার কীর্তি অবিনশ্বর। সম্রাটের কথা অলিন্দ থেকে অলিন্দে প্রতিধ্বনিত হলো কীর্তি, কীর্তি। প্রাসাদের ছাদ থেকে এক ঝাঁক সাদা, কালো পায়রা নীল আকাশে পাখা মেলে উড়ে গেল। সোনা রোদে মানুষের মনের অসংখ্য আশার মতো তারা যেন চিকমিক করছে।

সম্রাট তখন যেন গভীর ধ্যানে। মুখে কোন কথা নেই। গোলাপের একটি দুটি পাপড়ি ঝরে পড়েছে তাঁর রেশমের পোষাকের উপর। প্রবীণ শিল্পী ঈশা বুঝেছে সম্রাট তার চেয়েও বড় শিল্পী। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে ফুটে উঠছে। ঐ দুটি গভীর চোখে তিনি যে ভারত গড়তে চান সেই ভারতের ছবি যেন ভাসছে। ঈশা মনে মনে সম্রাটের পায়ে মাথা ঠেকালো। সেও শিল্পী, সে জানে মহৎ যা কিছু তা প্রথমে কল্পনাতেই ফুলের মতো পাপড়ি মেলে।

ঈশার ঘোর কেটে গেল। কে যেন তার কানের কাছে সসম্ভ্রমে জানালো—চলুন আপনাকে আপনার স্থপতিশালায় নিয়ে যাই। তারপর ফিস ফিস করে বলল—সম্রাট এখন অন্য জগতে, সম্রাটের এখন নামাজের সময়।

আপনার শুভ নাম ?

আমি, আমি আশাদ খাঁ। আমি সম্রাটের অন্তঃপুরের রক্ষক।

ঈশা মহম্মদ সেই সুন্দর যুবকের কথায় সৌন্দর্যে মুগ্ধ হল। রাজরক্ত যার সর্ব অঙ্গে প্রবাহিত তারই তো চেহারা এই।

সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল চত্বর পেরিয়ে তারা দু'জনে চলেছে হাতি

দরওয়াজার পাশে সম্রাটের পুরোনো গ্রন্থাগারের দিকে। ঠিক হয়েছে এই গ্রন্থাগারই হবে ঈশার বাসগৃহ, ঈশার স্থপতিশালা। যেতে যেতে ঈশা একবার পেছন ফিরে তাকালেন। ঐ দূরে শ্বেত পাথরের স্ট্যাচু, কোন নিপুণ ভাস্করের তৈরি।

দিন যায় দিন আসে। ওস্তাদ ঈশার বাটালি কাজ করে চলেছে এক খণ্ড জয়পুর মার্বেলের উপর। ওস্তাদ একটি জালি তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন ক'দিন হলো। আজ শেষ হবে তাঁর কাজ। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি পাথরের বুকে ফুল, পাতা আর কুঁড়ির আর একটি হরিণ শিশুর রূপকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে, নিরস পাথরও যেন কথা বলতে চাইছে। আর একটু পরেই এই জালিটি তিনি উপহার দেবেন সম্রাটকে।

মিনারে তখন সানাই বাজছে প্রভাতী সুরে। দূরে একদল ঘোড়সওয়ার নানা কায়দায় ঘোড়া ছোটাচ্ছে। দিল্লীর ধুলো ঘোড়ার পায়ে পায়ে একটা পর্দা তৈরি করেছে। ঘোড়সওয়াররা কখন স্পষ্ট কখনও অস্পষ্ট। মনটা আজ খুশী খুশী। অনেক খেটে কাজটি আজ সমাপ্ত হয়েছে। ক'দিন যেন ডুবে গিয়েছিলেন কাজের সমুদ্রে। মনে হলো অনেকদিন পরে বাইরের জগৎ দেখছেন, তাই কি এত ভাল লাগছে চারিদিক? বিশাল তোরণের তলা দিয়ে ঈশা মহম্মদ রাজ দরবারে প্রবেশ করলেন। নকিব হেঁকে ঘোষণা করল—ওস্তাদ ঈশা মহম্মদ। একটি দুটি তিনটি সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ঈশা হাজির হলেন সম্রাটের সিংহাসনের সামনে। কুর্নিশ করে ধীরে ধীরে বললেন—জাঁহাপনা আমার প্রথম কাজটি আপনার কাছে নিবেদন করার অনুমতি দিন।

সম্রাট মৃদু হেসে জানালেন—আমি উদগ্রীব, কোথায় তোমার সেই জিনিষ ঈশা।

সম্রাটের অনুমতি পেলেই এসে যাবে।

চারজন খোজা ধরাধরি করে নিয়ে এল সেই অসাধারণ জালি। সামান্য একটি পাথরের টুকরো শিল্পীর ছেনি আর বাটালির স্পর্শে একি

অসাধারণ রূপময় হয়ে উঠেছে। সম্রাট একবার দেখলেন, দু'বার দেখলেন। সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঈশাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আল্লা তোমায় দীর্ঘজীবি করুন। এই জালি লাগানো হবে আমার মহিষীর মহলে। সেখানে আমার মমতাজ—সম্রাট থেমে গেলেন। মমতাজ মহলের কথায় তার কণ্ঠ আবেগরুদ্ধ হয়ে যায়।

ঈশা আভূমি মাথা নীচু করে এই সম্মান গ্রহণ করলেন। এর থেকে বড় সম্মান আর কি আছে! প্রধানা মহিষীকে যে শিল্প-কর্ম উপহার দেওয়া যায় নিশ্চয়ই গুণ বিচারে সম্রাট তাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন।

আশাদ খাঁ সেই জালি নিয়ে চললেন জেনানা মহলে। খোজাদের হুকুম দিলেন লাগাও। জেনানা মহলের সুন্দরী মহিলারা ভিড় করে দাঁড়ালেন চারপাশে। সুন্দরীরাই জানে সৌন্দর্যের কদর। জেনানা মহল যেন ইন্দ্রের ইন্দ্রপুরী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিষে সুসজ্জিত। সম্রাট যখন যেখানে গেছেন যখন যা শ্রেষ্ঠ উপহার পেয়েছেন তাই দিয়ে সাজিয়েছেন এই মহল। এ যে তাঁর মমতাজ মহল। যেদিকেই চোখ ফেরাও দেখ সম্রাটের মনের অনুরাগে সুন্দর এর প্রতিটি অংশ।

এদিকে আশাদ খাঁ-এর অবস্থা অতিশোচনীয়। একে দিল্লী গরম। তায় আবার সুন্দরী মহিলাদের শরীরের গরম। চারিদিক থেকে তারা চেপে আসছে। অমন অসাধারণ একটি কারুকার্য দেখার জন্যে কে না ব্যস্ত হবে। সম্রাটের নিজের পছন্দ করা জিনিষ। শিল্পী এদের মন হরণ করেছেন। দেহের কথা ভুলিয়ে দেহবোধ শূন্য করেছেন। আশাদ খাঁ-এর কিন্তু অন্য চিন্তা, তিনি ঐ জালি দেখছেন না, তিনি ঐ সুন্দরীদের অন্য কাউকে দেখছেন না, দেখছেন এক দৃষ্টিতে একটি মাত্র মেয়েকে, তার নাম নাসীম।

নাসীম মানে মলয় সমীর। নাসীম মানে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। নাসীম সম্পর্কে তাঁর বোন। আশাদ আজ কতদিন ধরে চেষ্টা করছেন তার মন ভেজাবার। তুমি একটু কাছে এস, একটু হাস, দেখ আমাকে দেখ, আমার শরীরেও রাজরক্ত আছে। আমিও কিছু

কম সুন্দর নই। কিন্তু কই নাসীমের মন ভেজে কই! সে যেন আশাদকে দেখেও দেখে না, শুধু দূর থেকে তার মনকে পুড়িয়ে দিয়ে যায়।

ঐ তো সেই নাসীম। সকালের ফুলের মত তাজা শিশির ভেজা। নাসীম তন্ময় হয়ে দেখছে। কি অপূর্ব সৃষ্টি। এক একটি চরিত্র ঐ জালির উপর জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কে সেই শিল্পী।

আশাদ সাহেব, কার কাজ এটি কে সেই শিল্পী আশাদ?

নাসীম কথা বলছে। যেন বাঁশী বাজছে। আশাদের শরীর কেঁপে উঠল। নাসীম তার সঙ্গে কথা বলছে। সে যে কথাই হোক। আশাদ নিজেকে সামলে নিল।

সে যেই হোক না নাসীম, তাতে তোমার কি। শিল্পীর নাম ওস্তাদ ঈশা মহম্মদ। সম্রাট তাকে নিয়ে এসেছেন দূর পারস্য থেকে।

কেমন তাকে দেখতে আশাদ?

এ-প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন আশাদ খাঁ। নাসীম কি শিল্পীর কাজে এতই মুগ্ধ যে তার নাড়ী নক্ষত্র সবই জানতে হবে। আশাদ কি তার কাছে কিছুই নয়!

অতি সাধারণ লোক সে নাসীম। দেখতেও এমন কিছু সুন্দর নয়। তাছাড়া তার বয়স হয়েছে নাসীম। কি হবে তার কথা ভেবে। তার চেয়ে এসো আমরা নিজেদের কথা বলি।

কিন্তু কোথায় কি! নাসীম দাঁড়িয়ে রইল সেই জালির সামনে। তার চোখে পলক পড়ছে না। তার হৃদয়ের কোষে কোষে যেন কিসের জোয়ার। আবেগের জোয়ার, অনুভূতির জোয়ার। কোথায় কোন সুদূর সৌন্দর্যের অনন্ত আলোকিত লোকে তার মন তখন একটা রঙীন পাখীর মতো উড়ছে। কখন তার পাশ থেকে সকলে চলে গেছে সে টের পায়নি, এমন কি আশাদও নিঃশব্দে সরে পড়েছে, কারণ স্বয়ং বেগম সাহেবা মমতাজ মহল এসে দাঁড়িয়েছেন সম্রাটের পাঠানো উপহারের সামনে।

খুব ধীর মৃদু গলায় ডাকলেন—নাসীম।

উঃ, বেগম সাহেব আপনি?

তোমার ভাল লেগেছে নাসীম।

অসম্ভব ভাল লেগেছে মহারানী। আমি সেই ভাস্করকে চিনিনা, আমি তাঁকে কখনও দেখিনি, কিন্তু যিনি এমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারেন, আমি তাকে ভালবাসি।

সেদিন রাতে পৃথিবী তখন সুষুপ্তির কোলে। এক আকাশ তারা ঝুঁকে আছে প্রাসাদের উপরে। ছায়া পথ চলে গেছে দূর থেকে দূরে। সম্রাটের জেনানা মহল থেকে বোরখা ঢাকা একটি মূর্তি থাম আর কার্নিসের ছায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো মিশে বেরিয়ে এল। দ্রুত পায়ে চন্দ্রালোকিত প্রাঙ্গন পেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে চলে গেল হাতি-দরওয়াজার পাশে পুরোনো গ্রন্থাগারের দিকে। ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ালো ওস্তাদ ঈশা মহম্মদের জানালার পাশে। জাফরীর জালির কারুকার্য ভিতরের আলোয় লুটিয়ে পড়েছে সবুজ মাঠের উপর। পৃথিবী ঘুমিয়েছে, কিন্তু শিল্পীর চোখে ঘুম নেই। তাঁর যন্ত্র কাজ করে চলেছে পাথরের পায়ে। এই তো সেই শিল্পী, বোরখার জালি ঢাকা খুলে নাসীম তাকিয়ে রইল লম্বা একটি মানুষ, না যৌবন চলে গেছে, আশাদ ঠিকই বলেছিল। কিন্তু কি সুন্দর গম্ভীর সৌম্য মুখের চেহারা। টুক টুক করে দরজায় টোকা পড়ল। ঘরের ভেতর শিল্পী চমকে উঠলেন। কে এল এত রাতে! কে আসতে পারে! কলম নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি দরজা খুলেই চমকে উঠলেন—ফিস ফিস করে বললেন—কে হতে পারে।

তাড়াতাড়ি ভেতরে যেতে দিন আমাকে না হলে কেউ দেখে ফেলবে। নাসীম চাপা গলায় বলল।

ঈশা তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালো। ঘরে ঢুকে নাসীম বোরখার আড়াল থেকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

কে আপনি, এত রাতে আমার এখানে, কি কারণে?

আমি, আমি মহারাণীর সেবিকা। কথা আটকে যাচ্ছে নাসীমের গলায়।

কিন্তু এখানে কেন? এখানে তো আসা আপনার উচিত হয়নি।

তাইতো লুকিয়ে এসেছি।

কি সুরেলা বাঁশীর মতো কণ্ঠস্বর। যদিও বোরখার আড়ালে মুখ ঢাকা, কিন্তু শিল্পী ঈশা এক কথায় বুঝেছেন মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী।

আজ যে জালিটি আপনি পাঠিয়েছিলেন, সম্রাট সেটি আমাদের জেনানা মহলে লাগিয়ে দিয়েছেন। আমি জানাতে এসেছি, শিল্পীকে জানাতে এসেছি এমন অসাধারণ কাজ আমি আগে আর কখনও দেখিনি। আমরা প্রকৃতই মুগ্ধ। আপনার মতো যশস্বী শিল্পীর পায়ের ধুলো নিতে এসেছি।

ঈশা কি বলবে বুঝতে পারল না, তারপর একটু ভেবে আবেগ রুদ্ধ গলায় বললেন—দিদিমণি, আপনাদের ভাল লেগেছে, আমার জীবন আজ স্বার্থকতায় ভরপুর হলো।

নাসীম মুখ নীচু করে জানালো—আমি নিজের মুখে আপনাকে আমার মনের কথা জানাব বলেই এই রাতে চুপি চুপি এসেছি।

কিন্তু এই গভীর রাতে একেবারে একলা। আপনার ভয় করল না?

ভয়! আমার মনের প্রবল ইচ্ছা সমস্ত ভয়কে জয় করেছে। সে কথা থাক প্রভু, আমি যখন সাহসে পাখা মেলে আসতে পেরেছি আপনি কি আপনার আর কিছু কাজ আমাকে দেখাবেন না?

রাজা, মহারাজা, সম্রাট, শ্রেষ্ঠী অনেকেই ঈশার কাজ দেখতে চেয়েছেন, কিন্তু গভীর রাতে এমন মধুর গুণগ্রাহী তিনি আগে কখনও পাননি। শিল্পীর সত্বা বড় কোমল, সেখানে যে একটু স্পর্শ দিতে পেরেছে সেই শুনতে পাবে জলতরঙ্গ। এক মুহূর্তে ঈশা আর নাসীমের মাঝে সব ব্যবধানের পর্দা খুলে গেল। দুটি মন দুটি রাত জাগা পাখীর মতো তখন মুখোমুখি। বাইরে চন্দ্রালোকিত নির্জন প্রান্তরে হাওয়ায় পায়চারি, আকাশে অগণিত গ্রহ, উপগ্রহ, আর একঘর অনুভূতির গলাজলে দাঁড়িয়ে দুটি প্রাণী শ্রেষ্ঠ শিল্পী আর শ্রেষ্ঠ

গুণগ্রাহী। প্রেমের মুকুলটি যেন ঠিক তখনই খুলে গেল। সময়ের হিসেব কে রাখে? প্রাসাদের ঘড়ি ঘরে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

ওস্তাদ আমি তবে যাই এখন।

চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিই।

হয়ত আবার দেখা হবে।

আমি তো পথ চেয়েই থাকব, কিন্তু প্রাসাদের প্রহরা পেরিয়ে কেমন করে আপনি আসবেন। না না, আপনি আমার জন্যে কোন ঝুঁকি নেবেন না। এই রাত, এই একটি রাত শুধু জীবনে থাক অমর হয়ে।

আমি কি আর জেনানা মহলে গিয়ে আপনাকে দর্শন করতে পারব?

না, তাহলে আমার ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে যাবে।

এই তো আমি বোরখা খুলছি, আপনি দেখুন।

ওস্তাদ ঈশা স্তম্ভিত। সৌন্দর্যের অপর নাম কি নাসীম। আল্লা তোমার অকৃপণ হাতে কি তুমি তোমার সৌন্দর্যের ভাণ্ডার এই মেয়েটিকে দিয়েছ। এ যেন এক শুভদৃষ্টি। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, ভাষা সেখানে ভাবে স্ফটিক, অনুভূতি সেখানে অসংখ্য ফুল। প্রেমের কুঁড়ি যেন দেখতে দেখতে একটি শতদল পদ্ম হয়ে গেল।

শেষ রাতে, অলিন্দের ছায়ায় ছায়ায় ছায়ামূর্তি ফিরে গেল রাজ-উদ্যানের পথে জেনানা মহলে। সিংহ দরজা পেরিয়ে যেমনি নাসীম পা রাখল প্রাসাদে, অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল আর একটি মূর্তি, নিঃশব্দ বেড়ালের মতো, প্রতিহিংসায় শক্ত, আশাদ খাঁ—শক্ত হাতে নাসীমকে পেছন থেকে চেপে ধরল।

কোথায় গিয়েছিলে এত রাতে?

আতঙ্কে নাসীম তখন কুঁকড়ে গেছে।

তুমি ভেবেছ, পৃথিবীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই না? কিন্তু না। একজন তোমার জন্যে জেগে আছে—সে হল আশাদ খাঁ। যত

বোরখাই চাপাও আমি তোমাকে ঠিক চিনে নেব। কেন তুমি ঈশার ঘরে গিয়েছিলে? বল, বল, কিসের জন্যে তোমার এই দুঃসাহস?

নাসীমের মুখে কোন কথা নেই। সে ধরা পড়ে গেছে। সে জানে এই লোভী রাজপুরুষটিকে সে একটুও ভালবাসে না। অথচ একটা ছায়ার মতো সে তাকে অনুসরণ করছে। ঘৃণা, অসম্ভব ঘৃণায় সে বাক্যহারা। আশাদের চোখ জ্বলছে এই অন্ধকারে সাপের মত। সমস্ত প্রাসাদ নিঝুম নিস্তব্ধ। সম্রাট হয়ত তখন মমতাজ মহলের বুকে মাথা রেখে শেষ রাতের স্বপ্ন দেখছেন। কেউ জানল না প্রাসাদের আর এক কোণে জীবনের একটি বাস্তব নাটকের অভিনয় হচ্ছে।

তোমার এতটুকু লজ্জা করল না? তোমার সম্ভ্রমে লাগল না? তোমার গায়ে নীল রক্ত বইছে, তুমি কিনা সব ভুলে দৌড়ে গেলে ঐ মিস্তিরিটার কাছে ছি, ছি। আমি যদি এই কথা প্রকাশ করে দিই কি হবে জান, তোমাকে রাণীসাহেবার মহল থেকে দূর করে দেওয়া হবে।

না না তুমি বলবে না। নাসীম আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল—বিশ্বাস কর আমার অন্য কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। আমি সেই অনবদ্য ভাস্কর্যের সৃষ্টিকর্তা ভাস্করকে কেমন দেখতে তাই দেখতে গিয়েছিলাম। নিছক মেয়েলী খেয়াল।

বেশ তো সেই দেখার বিনিময়ে তুমি কি পেলে?

নাসীম এবার অন্ধকারে একটু মুচকি হাসল। মনে মনে বলল, মূর্খ আশাদ তুমি কি বুঝবে।

তাহলে আমি মহারাণীকে কথাটা কাল সকালেই বলি।

না, আশাদ না, ও কাজ কারো না।

বেশ, একটি শর্তে আমি রাজি—সে শর্ত হলো, তুমি আমাকে সাদী করবে। কথা দাও, ঐ একটি মাত্র শর্তে আমি আজকের রাতের ঘটনা কাউকে কোনদিন বলব না।

এইবার নাসীম ছিটকে উঠল, লক লক করে উঠল তার ক্ষুরধার জিভ—যাকে খুশী তুমি বল গে যাও। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি

নেই যা আমাকে বাধ্য করাবে তোমাকে বিয়ে করতে। মূর্খ তুমি, তুমি বেহেড। তুমি বেহেড। তুমি একটা পাগল, শয়তান, ছায়া মূর্তি। ছায়া কোণে মিলিয়ে গেল। বিশাল প্রাসাদের বিচিত্র ঘটনার স্রোতে মুহূর্তে মিশে গেল।

সাত-সকালেই মমতাজ মহলের কাছে আশাদ গিয়েছিল নাসীমের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। কিন্তু বড্ড বেশী দেরী করে ফেলেছ আশাদ খাঁ। বোধহয় শেষ রাতে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। নাসীম কিন্তু সে রাতে ঘুমোতে পারেনি। রাজমহিষী তখন ভোরের আকাশে সূর্যের আলপনা দেখছেন, নাসীম তাঁর পায়ের কাছে কেঁদে পড়ল—

অপরাধ করে ফেলেছি ক্ষমা করুন।

প্রেম কি জিনিষ মমতাজ মহল জানেন। এখন বুকের বাঁ-দিক গরম। এই একটু আগেও সম্রাটের মাথাটি ছিল এই জায়গায়। তিনি নাসীমকে শাসন করলেন।

আর এমন মুর্খামী কখনও করবে না। আমি জানি এ হলো চরম ছেলেমানুষী। আর কখনও যাবে না ওখানে।

না মহারাণী, আমি কখনও যাবো না, যদিও তার মানে হলো এই যে ওস্তাদকে আমি আর কোনদিন দেখতে পাবো না।

মমতাজ মহলের ঠোঁটের কোণে ক্ষমার হাসি, প্রেমের হাসি—

তুমি দেখা করতে চাও?

মহারাণী আমার হৃদয় যে সে চুরি করে নিয়েছে।

ঠিক আছে, শান্ত হও। বলা যায় না ভবিষ্যতের গর্ভে কি লেখা আছে।

সেই চন্দ্রালোকিত রাত, সেই হাতি দরওয়াজার পাশে ভাস্করের ঘর। কিন্তু একি আজ এত রোশনাই এত ফুল এত সুরের সমারোহ কেন। সকলেই বলছে মমতাজ মহলের হৃদয়ের কথা। এমন দয়ালু তাই না এত সুখী, এত সমবেদনা তাই না এত প্রেমিক। আজ যে নাসীমের বিয়ে। সেই তার প্রাণের মানুষ ওস্তাদ ঈশার সঙ্গে। আহা বেচারা আশাদ। প্রাসাদে সবাই খুশী, আশাদ ছাড়া। সে বলেছে

এই শেষ নয় আমারও দিন আসবে তখন দেখে নেবো তোমাদের সুখের সংসার ভাঙে কি না। নাসীমের সুখের শেষ নেই। মহারাণী সম্রাটের মেজাজ বুঝে অনুমতি আদায় করে এ বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

সুখী দম্পতীর জীবনের উপর দিয়ে কয়েকটি বসন্ত চলে গেল। আশাদের বিষাক্ত নিশ্বাস নিস্ফল হলো। ওস্তাদ ঈশার হাত যেন আরো খুলেছে, নাসীমের প্রেমে সে পৃথিবীর রুক্ষতা ভুলেছে। তার বয়স যেন কমে গেছে। নাসীমকে কোলে টেনে নিয়ে সে বললে—

আমাদের প্রেমকে আমি ইতিহাস করে রেখে যাবো। ভবিষ্যতের মানুষ দেখবে, অনুভব করবে নাসীম আর ঈশার স্বর্গীয় প্রেম।

কি ভাবে করবে তুমি?

কেন, আমার মনকে তোমার প্রেমের রঙে চুবিয়ে আমার অনুভূতিকে তোমার মনের স্পর্শে কোমল করে আমি আমার ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন একটি স্মারক গড়ে তুলব, যার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ বলবে প্রেম যুগে যুগে। আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে দেব সেই শ্বেত পাথরের সৌধে।

শিল্পীর যে কথা সেই কাজ। ঘর ভরে আছে তার ভাস্কর্যে, নাসীমে, নাসীমের শরীরের ঘ্রাণ, চুড়ির রিন ঝিন, তার সুরেলা গলা, তার সুনিপুণ গৃহিনীপনা যেন একটি জীবন্ত ভাস্কর্য। আর এদিকে শিল্পী কাগজে নক্সা করে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন একটি নিখুঁত স্মারক সৌধের অনবদ্য মডেল।

নাসীম অবাক। এ যে পাথর কা ফুল। এ যেন পাথরের ভাষা। মানুষ কি কোনদিন এর চেয়ে ভাল কোন, শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের কথা ভাবতে পারবে! ঈশার গলা জড়িয়ে নাসীম বলল—এ যেন স্বপ্ন, এ যেন কোন বাস্তব নয়।

ঈশা তার গালে মুখ রেখে বলল—এ তোমার প্রেম, এ আমাদের প্রেমের ভাষা। দু'জনের শরীর মিশে গেল।

সেদিন সকালে দুর্গপ্রাকারে প্রচণ্ড কোলাহল।

দেখ ত নাসীম কি হলো। ঈশার হাতের যন্ত্র তখন একখণ্ড পাথরে ব্যস্ত।

বোধহয় নতুন কোন সাম্রাজ্য বিজয়ের খবর এসেছে।

দাঁড়াও দাঁড়াও খবরটা নিয়ে আসি। ঈশা বেরিয়ে গেলেন।

ঈশা ফিরে এলেন চোখের কোণে জল—

না পরাজয়ের কোন খবর নয়, তার থেকেও ভীষণ।

কি, হয়েছে কি ঈশা?

সে খবর তুমি সহ্য করতে পারবে না নাসীম, তুমি যে বড় কোমল!

সে কি, কি খবর বল শিগ্‌গীর?

মনকে শক্ত কর, বল ভেঙে পড়বে না।

না না, তুমি শিগ্‌গীর বল!

আমাদের জীবনের নক্ষত্র, আমাদের কল্যাণময়ী মমতাজ মহল মারা গেছেন।

সে কি—উঃ আল্লা!

চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী ঘুরছে, সূর্যের আলো যেন ম্লান হয়ে আসছে। পা কাঁপছে, নাসীম, নাসীম ঈশার ব্যাকুল ডাক যেন কোন দূর লোক থেকে ভেসে আসছে।

তাহলে সম্রাটের মনের অবস্থা কি! যাঁর জীবন মানেই মমতাজ। ঐ তো অবসন্ন একটি মূর্তি ঘোড়ার পিঠে ঢুকছেন দুর্গে। রাজ্য বিজয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে। মনের মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া বইছে—মমতাজ নেই, মমতাজ আমার জীবন জ্যোতি।

সম্রাট সাজাহান ঘোষণা করলেন, আমার এই প্রেমকে আমি সমগ্র জগতের সামনে অমর করে রেখে যেতে চাই। আমি শ্বেতপাথরে এমন এক সমাধি তৈরি করব যার সমগ্র অবয়বে সাজাহান আর মমতাজের প্রেম অক্ষয় হয়ে থাকবে। পাঠাও তোমাদের দূত দেশে দেশে, ঘোষণা করে দাও পুরস্কার, সবচেয়ে সেরা নক্সা যে দিতে পারবে সেও অমর হয়ে থাকবে এই নশ্বর পৃথিবীতে।

দিগ্বিদিক্ থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর মানুষেরা এলেন মমতাজকে অমর করে রাখতে কালের কপোলতলে এক বিন্দু নয়নের জলকে ধরে রাখতে। তুরস্ক থেকে এলেন সত্তর খান, তিনি পাথরের উপর হরফ

খোদাই করবেন। এলেন সমর খন্দ থেকে মহম্মদ আরিফ, ইনি পাথরের গায়ে ফুল লতাপাতার কারুকার্য ঢেলে দেবেন। শিরাজ থেকে এলেন আমানত খান, ইনি সেই সমাধির অভ্যন্তরে শব্দের মায়াজাল সৃষ্টি করবেন, একটি শব্দ যেন অসংখ্য অশরীরী মানুষের কণ্ঠে একটা অব্যক্ত বেদনায় পাথরের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হবে হাওয়ার শব্দ। শোনাবে দীর্ঘশ্বাসের মতো। আকবরাবাদ থেকে এলেন মহম্মদ হানীফ, ইনি সমস্ত কাজের সমন্বয় করবেন এবং ঈশা মহম্মদের নির্দেশ সকলের কাছে পৌঁছে দেবেন।

ঈশা মহম্মদের প্রতিভার ছায়ায় এসে সবাই মিলেছেন, স্থপতি, ভাস্কর, কারিগর। বিশ হাজার শ্রমিক তাঁবু গেড়েছেন আগ্রার উপকণ্ঠে। সবাই প্রস্তুত। কিন্তু কই নক্সা কোথায়, সমাধির মডেল কই? নাসীম জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। এত লোক কত লোক। নিজের দুঃখকে সে সকলের মধ্যে হারিয়ে দিতে চায়। আর মাঝে মাঝে ঈশাকে উৎসাহিত করে। সে দেখে স্বামীর চোখে ঘুম নেই, সারারাত কাগজে সে নক্সা পাতে আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে। নাসীম বুঝতে পারে প্রতিভার কি যন্ত্রণা, এমন একটা কিছু সে সৃষ্টি করতে চাইছে যা হবে অতুলনীয়। এ যেন এক নীরবচ্ছিন্ন গর্ভযন্ত্রণা। কিন্তু কেন এই যন্ত্রণা, ঈশা তো একটি মডেল তৈরিই করে রেখেছেন।

কেন তুমি এত উতলা হচ্ছ, ঈশা তুমি তো ঐ মডেলটিই দিয়ে দিতে পার। আমাদের প্রেম, আমাদের মিলন তো সেই মহারাজ্ঞীর দান, তবে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্প কর্মটি কেন তুমি তার নামেই উৎসর্গ করছ না?

না নাসীম। তা হয় না। ওটা কেবল আমাদের, আমাদেরই। ওতে অন্য কারুর অধিকার নেই। তুমি আমার কাছে সব চেয়ে নাও, কেবল ঐটি চেও না।

আশাদ খাঁ-এর দপ্তরে সাত-সকালেই তার গুপ্তচর এসে হাজির।

হুজুর আপনার নির্দেশ মতো আমি সব সময় ঈশা মহম্মদকে চোখে চোখে রেখেছি। লোকটি হুজুর পাগলের মতো আচরণ করছে। আঁকছে,

ছিঁড়ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য জানেন, একটা ভারী সুন্দর মডেল তৈরিই আছে। আপনি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না, কি সুন্দর। মানুষ যে এমন স্বর্গীয় জিনিষ তৈরি করতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

বুঝেছি। তুমি এখন যাও, আমি দেখছি। নজর রাখ সব সময়, লোকটা শয়তান। আশাদ খাঁ আরশির সামনে দাঁড়িয়ে মাথার ফেজটা ঠিক করে নিল। এইবার দেখব ঈশা মহম্মদ, নাসীম বেগম তোমাদের কে রক্ষা করে? মমতাজ মহলের মৃত আত্মা না স্বয়ং সাজাহানের জল্লাদ। সুযোগ আমার হাতের মুঠোয়। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ।

কি খবর আশাদ খাঁ। কাজ এগোচ্ছে ঠিক?

জাঁহাপনা আয়োজনের তো কোন কসুর হয়নি, কিন্তু মহারাজ মডেল তো এল না, নক্সা কই?

ঠিক বলেছ আশাদ, অনেক নক্সাই এল কিন্তু মনে ধরছে না কোনটাই।

অথচ যার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ নক্সাটি আসবে বলে ভেবেছিলাম তার কাছ থেকে তো কোন খবরই এল না! কি ব্যাপার বলত আশাদ?

সে এক রহস্য জাঁহাপনা। যদি সাহস দেন তো বলতে পারি। আমি সেই রহস্য বোধহয় কিছুটা জানতে পেরেছি।

রহস্য! এর মধ্যেও রহস্য।

আজ্ঞে হ্যাঁ জাঁহাপনা। আপনার প্রিয় ভাস্কর, তার সম্বন্ধে কিছু বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে অনেকেই সে রহস্য জেনে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

বল শুনি, আমি তো মনে হচ্ছে কিছুই জানি না।

জাঁহাপনা, ঈশা অনেক আগেই একটি মডেল তৈরি করে ফেলেছে যার কোন তুলনা নেই। সে কেবল সময় নিচ্ছে টাকার লোভে। আপনি যেই পুরস্কারের অঙ্কটি বাড়াবেন সঙ্গে সঙ্গে সে সুড় সুড় করে নক্সা, মডেল সব হাজির করবে।

আমি বিশ্বাস করি না। অসম্ভব, ঈশার মতো নির্লোভ মানুষের পক্ষে এ একেবারে অসম্ভব। তাকে আমি জানি ঈশ্বরের দূত হিসেবে, তুমি তাকে হাজির করলে শয়তানের দোসর করে।

জাঁহাপনা সকলের মুখেই ঐ এক কথা। সকলের ধারণাই পাল্টাচ্ছে। যদি অনুমতি করেন একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।

বেশ, সে অনুমতি দিলাম, তবে তার বেশী কিছু নয়।

শিল্পীর ঘরে তখন সেই মুহূর্তে এক অপূর্ব দৃশ্য। ঈশার কাঁধে মাথা রেখে নাসীম দাঁড়িয়ে আছে একটা খোদাই করা পাথরের টুকরোর সামনে। এই একটু আগে কাজ শেষ করে ঈশা ডাক দিয়েছেন নাসীমকে। নাসীম তার সবচেয়ে বড় সমঝদার। সে যদি ভাল বলে সকলেই ভাল বলবে। এমন সময় দরজায় ধাক্কার পর ধাক্কা। ভৃত্য দরজা খুলে দিল। সামনেই আশাদ খাঁ।

ওস্তাদ ঈশা, বুঝতেই পারছ আমি কেন এসেছি। আমি এসেছি সম্রাটের কাছ থেকে। সম্রাটের কানে গেছে তুমি একটি মডেল তৈরি করে রেখেছ। কেবল আরো বেশী টাকার লোভে সেটিকে চেপে রেখেছ আর এই ভাবেই কাজের দেরী করাচ্ছ।

মিথ্যে কথা কে বলেছে। গুজব।

ভেবে বলছ? আমি কিন্তু একলা আসিনি। সম্রাটের সৈন্য বাহিনী বাইরে প্রস্তুত, নির্দেশ পেলেই তোমার ঘরখানা তল্লাসী করবে।

কিসের জন্যে! সেই মডেলের জন্যে! কোন দরকার নেই। মডেল তো আপনার চোখের সামনেই রয়েছে। কাঠের টেবিলের উপর ছোট মাটির তৈরি মডেলটি হাতে তুলে নিয়ে শিল্পী আশাদ খাঁর সামনে রাখলেন। খাঁ সাহেবের চোখ ঠিকরে গেল।

সম্রাটের কাছে এই মডেল কেন জমা দেওয়া হয়নি?

এটাতো সম্রাটের জন্যে তৈরি হয়নি খাঁ সাহেব। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর অনেক আগেই এটি আমি তৈরি করেছি, আমার আর নাসীমের ভালবাসার স্বর্গ, প্রেমের স্মারক।

তার মানে! তুমি সম্রাটকে দেবে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ, অথবা কিছুই দেবে না আর নিজের জন্য রাখবে সবচেয়ে সেরা কাজ। এই তোমার আনুগত্য। তুমি নিমকহারাম। তুমি সিংহাসনকে অপমান করেছ। এ অপমানের শাস্তি জান।

এ তো কোন অপমান নয়। আপনি এর মর্যাদা দিতে পারবেন না। তবে আমার বিশ্বাস, সম্রাট শুনলে ব্যাপারটা বুঝবেন।

সম্রাট সব শুনেছেন। শুনেই আমাকে পাঠিয়েছেন। মডেলটি অবিলম্বে তুমি আমার হাতে দেবে।

আমি দিতে পারব না।

কি সাহস! তুমি স্বয়ং সম্রাটের আদেশ মানছ না! তুমি বিদ্রোহী।

নাসীম ঈশাকে বোঝাতে চাইল, ঈশা আমার অনুরোধ রাখ, তুমি দিয়ে দাও।

চাপে পড়ে দিয়ে দেবো, কখনই না।

একবার ভেবে দেখ ঈশা, জীবনের চেয়েও কি মৃত্যু বড়? আমাদের এই জীবন কি সবচেয়ে বড় সৌধ নয়। তবে কেন তুমি মৃত্যুতে অমর হতে চাইছ। ভেবে দেখ ঈশা, আর একবার ভেবে দেখ।

তুমি জান না নাসীম, আত্মসম্মান মৃত্যুর চেয়ে বড়। আমার সম্মান আজ আহত। খাঁ সাহেব আমার শেষ কথা—আমি এই মডেল দেব না।

বেশ তাহলে আমাকে জোর করেই কেড়ে নিতে হবে এবং তোমাকে বিদ্রোহী বলে পাঠাতে হবে কারাগারে।

আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না। যিনি জগতের রক্ষাকর্তা সেই শ্রেষ্ঠ সম্রাট সাজাহান কখনও এ কাজ করতে পারেন না। নাসীম চিৎকার করে উঠল।

একটি শান্ত স্থির গলা পেছনে দরজার সামনে থেকে বললেন—নাসীম তুমি ঠিকই বলেছ।

ও—ও-সম্রাট আপনি। নাসীম সম্রাটের পায়ের সামনে নতজানু হলো, চোখে তার জল। ঈশা সসম্ভ্রমে কুর্নীশ করল। আর আশাদ

খাঁ চরকি পাক খেয়ে অভিবাদন জানাল। মুখ তার তখন ফ্যাকাশে, ছাইয়ের মতো সাদা।

ভারত ঈশ্বর সাজাহান স্বয়ং এসেছেন শিল্পীর দরবারে নিজের দরবার ছেড়ে। তিনি যে ছিলেন স্বয়ং শিল্পী, জীবন শিল্পী। সেই দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মহানুভব সম্রাট আদেশ জারি করলেন—আমার যা শোনবার, নিজের কানে শুনলাম। যাও আশাদ খাঁ তোমার লোক-লস্কর নিয়ে প্রাসাদে ফিরে যাও।

ভিজে বেড়ালের মতো আশাদ খাঁ ফিরে গেল তার প্রতিহিংসার রাজত্বে। শিল্পীর প্রেমের পূজার দেউলে সে বেমানান। সম্রাট মডেলটি নিজের হাতে তুলে নিলেন। তার চোখে পলক পড়ছে না। অনেকক্ষণ পরে সম্রাট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেম—

ঈশা এর যে কোন তুলনা নেই। আমার মমতাজ মহলের সমাধি যে এর থেকে অন্য রকম কিছু হতে পারে না। আমি যদি বন্ধু হিসেবে তোমার কাছ থেকে এটি ভিক্ষে চাই তুমি আমাকে দেবে না?

ঈশা আর নাসীম, দু'জনে দু'জনের দিকে একবার তাকালেন। তারপর ঈশা রুদ্ধ গলায় বলল—

জাঁহাপনা আমরা হৃদয় দিয়ে আপনাকে খুশী করতে চাই, এ জিনিষ আপনারই।

ঈশা, শিল্পী ঈশার অনুভূতি তখন বাঁধ ভেঙেছে, সে বলে চলল—

মহারাজ এই দেখুন আমি দুটি সমাধি তৈরি করেছি। উপরেরটি সম্রাজ্ঞীর দেহ সৌন্দর্য। সোনার কিংখাবে এটি ঢাকা, ঐ দেখুন ঝাশর সেই মৃত্যু, সেই বিচ্ছেদের বেদনাকে প্রকাশ করছে। বেদনার দীর্ঘশ্বাস রূপ নিয়েছে এই বিশাল চূড়োয়। সেই দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনিত হবে এর দেয়ালে দেয়ালে, আর ঝাড় লণ্ঠনের বাতিগুলি কেঁপে কেঁপে উঠবে সেই শ্বাসপ্রশ্বাসের হাওয়ায়।

সম্রাট ফিরে গেলেন। শিল্পীর মডেল রূপ নিল তাজমহলে।

সময়ের স্রোত পেরিয়ে আমরা আজ অনেক দূরে চলে এসেছি। ঘটনাটা এখন ইতিহাস, এই মুহূর্তে এই চাঁদের আলোর রাতে যমুনার

বুকে তাজের প্রতিফলন দেখতে দেখতে যখন সেই প্রেমিক রাজা সাজাহান আর মমতাজ মহলের কথা ভাববেন তখন সেই নরম অনুভূতির মুহূর্তে ওস্তাদ ঈশা মহম্মদ আর নাসীমের জন্যেও হৃদয়ের কোণে একটু একটু জায়গা রাখবেন। তারা সম্রাট ছিল না তারা শ্রেষ্ঠ ছিল না। তারা ছিল প্রেমিক। তাদের প্রেমে রূপ নিয়েছিল সম্রাটের প্রেম।

৪

সময়ের স্রোত বেয়ে অনেকটা পিছিয়ে যেতে হবে। বেশ কয়েক শতাব্দী। স্থান, কাল, পাত্র সবই অন্য রকম। প্রায় তিনশো বছর আগেকার ইংল্যাণ্ড। সেই সব রাজকীয় সমারোহ এখনকার পৃথিবীতে হয়ত নিতান্তই বেমানান; কিন্তু তখন এই সব যন্ত্রযুগের সঙ্কীর্ণতার কোন স্থান ছিল না। একদিকে হয়ত মানুষ না খেয়ে মরছে, দারিদ্রের সে রকম বীভৎস রূপ এখনকার ইংলণ্ডে পাওয়া যাবে না, যেমনটি মার্ক টোয়েন এঁকেছেন তার 'প্রিন্স এণ্ড পপার' গ্রন্থে (সম্প্রতি একটি হিন্দী ছবি এই কাহিনী অবলম্বনে তোলা হয়েছে 'রাজা ঔর রঙ্ক')। ভারতবর্ষের কোন কোন অন্ধকার অঞ্চলে হয়ত আছে, দারিদ্রের সেই দাঁতালো চেহারা। অন্যদিকে সে কি রাজকীয় সমারোহ। বাইশ ঘোড়ার ল্যাণ্ডো চলেছে কোন রাজপুরুষকে বহন করে। ঘোড়ার পিঠে চলেছেন কোন বর্মাচ্ছাদিত নাইট। যার বেশভূষা, অস্ত্রশস্ত্র কিম্বা মসৃণ তেজস্বী ঘোড়ার রূপ চোখ ঝলসে দেবে। রাণী চলেছেন সিংহাসনের দিকে। পিছনে প্রায় এক ফার্লং দূরে তার পোষাকের আঁচল ধরে ধরে নিয়ে আসছে একশো সহচরী। এখনকার মিনিস্কার্ট পরা রাণী কিম্বা ট্রাউজার আর বুশ শার্ট পরা রাজাদের দেখলে সেই যুগের, সেই কেরোসিনের আলো জ্বলা, ঘোড়ায় টানা গাড়ীর যুগের এলাহি দরাজ ব্যাপার কেমন যেন কাহিনীর মতো মনে হতে পারে। কিন্তু ইতিহাসে আমরা সেই সব যুগের স্মৃতি পলির মতো ফেলতে ফেলতে

উপরে উঠে এসেছি। এখন হাত বাড়ালেই চাঁদ। পা বাড়ালেই অবশ্য রকেটে গ্রহান্তরের যাত্রী।

এমনি একটা অতীত দিনের অত্যন্ত প্রণয় মধুর একটি রাজকীয় পরকীয়া প্রেমের কাহিনী খুব খারাপ লাগবে না। প্রেম যুগে যুগে প্রেমই। পরিবেশ হয়ত ভিন্ন। পাত্রদের চালচলন হয়ত আলাদা। এখনকার প্রেম হয়ত সংক্ষিপ্ত কিংবা সঙ্কুচিত। শুরু আর শেষ হয়ত বোঝা যাবে না। মুকুল হয়ত ফোটার আগেই ঝরে। ব্যাপারটা যখন কাব্যিক, কাব্য করেই বলতে হয়। কিন্তু এই যে প্রেমের কাহিনী, যার পাত্রপাত্রী হলেন ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের কোন পূর্ব, পূর্ব, পূর্ব পুরুষ আর একজন সামান্য ইংলণ্ডের ফলওয়ালী। স্থান ইংল্যণ্ড। কাল সপ্তদশ শতকের শুরু। এই কাহিনী আজও শুধু অমর নয়, ভাগ্য ভাল হলে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের বাইরে যাবার সহজাত প্রবণতা থাকলে, আপনি স্বয়ং ঘটতে দেখবেন। সেই তিনশো বছর আগের পরিবেশেই, আজকের আপনি চোখ বড় বড় করে দেখবেন, সে যুগের অন্তরঙ্গ দৃশ্য। লণ্ডনে বসে একটি টেলিফোন নম্বর শুধু ডায়াল করতে হবে—৪২৭০১০১ খরচ করতে হবে মাথা পিছু চার গিনি। আসছি। এসব কথায় পরে আসছি। তার আগে আমরা তিনশো বছর আগেকার ঘটনাটা আর একবার ঝালিয়ে নিই।

কত সাল। ঐ যেমন আমরা বলি, ঠিক ঠিক জানা না থাকলে। ষোলশো সামথিং। লণ্ডনের ড্রুরি লেনে থিয়েটারের নাম অনেকেই শুনেছেন। পাথর বাঁধানো সেই রাস্তায় বহু মানুষের আনাগোনা। লর্ড, আর্ল, কাউন্ট, কাউন্টেস। তখনকার মানুষের অখণ্ড অবসর ছিল। মেজাজ ছিল। সময়ের পিছনে কেউ ধর ধর করে ছুটত না। বরং সময়ই এদের পিছনে পিছনে ছুটত। সেই সময় একজন লর্ড তো তার এস্টেটে ঘড়ির সময় তিন ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছিলেন। যুক্তি তাঁর জোরালো। আমি আমার সময়ে চলব। বাইরের ঘড়িতে যখন বেলা ১টা, তার এস্টেটের সমস্ত ঘড়িতে তখন ১০টা বেজে বসে আছে। তার রাজত্বে সময় চলত তার নিয়মে। এখন যেমন দ্রাঘিমা রেখা

পেরোলে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে হয় ঠিক তেমনি তার এস্টেটে ঢুকলেই ঘড়ির কাঁটা তিন ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হতো। তা সেই ড্রুরি লেনে থিয়েটারের পাশে বসে এক তরুণী কমলা লেবু বিক্রী করছে। তার নামটি ভারি অদ্ভূত—নেল গোয়াইনে। লেবু আর লেবুওয়ালা তুটি বস্তুই দর্শনীয়। মাদ্রিদের লেবু ক্যালিফোর্নিয়ার বীজ শূন্য লেবু কিম্বা স্পেনের রক্তবর্ণ লেবু সেই সুন্দরীর হাত থেকে তুলে নিতে কার না ভাল লাগবে। ব্যবসা তার ভালই চলে। কেন চলবে না—সে যে বিক্রী করতে জানে। একটি লেবুর সঙ্গে একটু মিষ্টি হাসি—লেবু আরো মিষ্টি মনে হয়। থিয়েটার পাড়া। আমীর ওমরাহের নিত্য আসা যাওয়া। মঞ্চে যখন লেডি ম্যাকবেথ—ব্লাড ব্লাড বলে তুহাত অনবরত ঘষছেন রক্তের দাগ তুলে ফেলার জন্যে। হ্যামলেট যখন দ্বিধাগ্রস্ত—টুবি অর নট টুবি। ওথেলিয়া যখন ফুলের সাজে মৃত্যুকে জড়িয়ে ধরছে। তখন—নেলের কমলালেবু দাঁতে কাটতে কাটতে থিয়েটারের মধ্যে কোন লর্ড হয়ত তাঁর লেডির কানে কানে বলছেন—সুপার্ব। কিন্তু কে জানত সেই লেবুওয়ালী হঠাৎ ভাগ্যের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে একদিন ঐ মঞ্চে কোন নাটকের রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের প্রমোদ সঙ্গিনী, শয্যা সঙ্গিনী, অস্বীকৃত জীবন সঙ্গিনী হবেন। ঘটে, এমন ঘটনাও ঘটে। আজও ঘটে। রূপকথার মতো ঘুঁটে কুড়ুনী শেষে রাজরানী হয়ে যায়।

মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল। চেহারায় চটক আছে। গলাটি মিষ্টি। কেমন কায়দা করে খদ্দের কে একটির জায়গায় একশোটি লেবু গছিয়ে দেয়। 'অভিনয় করবে নাকি ছুকরী'—হালকা করে বললেও কথার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। মুখটা ছুঁচমত করে বিচীটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাস্তার কোণে। পরিচালক মশাই নতুন নাটক নামাচ্ছেন। নাটক নতুন। নায়িকাও যদি নতুন হয়তো ক্ষতি কি? তালিম দিয়ে তৈরী করে নিতে হবে। নেলের মনে ভয়। অত বড় থিয়েটার। একবার সে দেখেছে। আলো ঝলমলে প্রেক্ষাগৃহে লোকে লোকারণ্য। দূরে ভেলভেটের পর্দা ঝোলানো

মঞ্চ। আলো নিভে গেল—মঞ্চ আলোকিত হলো। নায়ক আর নায়িকা মুখোমুখি। পাখী ডাকছে। ঝলমলে সুন্দর পোশাক। জিজ্ঞেস করে জেনেছিল ওদের নাম—রোমিও-জুলিয়েট। এদের যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই নাট্যকারের নাম যেন কি—মনে পড়েছে শেক্স-পিয়র। ওই অতলোকের সামনে অভিনয়। ভয় করবে না, পা কাঁপবে না, বুক দুর দুর করবে না। আর একটি লেবু পরিচালকের হাতে তুলে দিয়ে সে বললে—'আমি কি পারব'। তুমি—খানিকটা মিষ্টি রস গিলে নিয়ে পরিচালক বললেন—তুমি না পারলে কে পারবে। তোমাকে আমি আজ দেখছি। এই রাস্তায় বসে তুমি যা করছ তা তো ঐ অপেরার চেয়েও শক্ত গো। এ তো সেই ভারতবর্ষে যাকে বলে যাত্রা। আরো শক্ত জিনিস। চারিদিক খোলা মঞ্চ আর আমরা এই দর্শকরা তোমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছি। হো হো করে হেসে উঠলেন লর্ড, আর্ল আর কাউন্টের দল। বেড়ে বলেছে ডিরেক্টর ভদ্রলোক। নেলের চেহারাটা একবার চোখ দিয়ে চেটে নিল তারা। মনে মনে উলঙ্গ করে বোধহয় আনন্দ পেল। পরিচালক কিন্তু তখন গভীর ভাবে ভাবছেন—কেমন মানাবে নেলকে নাটকের সেই বিশেষ চরিত্রে।

ঘুচে গেল নেলের কমলালেবু বেচা। পর্দা উঠল মঞ্চে। নেলের জীবনে প্রথম অভিনয়-রজনী। নাট্যকার, পরিচালক উইংসের ফাঁক দিয়ে দেখছেন। বাঃ বাঃ কি অসাধারণ অভিনয় করছে মেয়েটি। চরিত্রটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দর্শকরা খুশীতে হাত তালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে। একজন লর্ড একটি আঙটি ছুঁড়ে দিলেন। নেলের মুখের মেকআপ তুলতে তুলতে পরিচালক বললেন—কি বলে ছিলুম তোমাকে। এতদিন লেবু বেচেছ, এবার বেচবে তোমার অনুভূতি আর, একটু আস্তে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললেন—আর তোমার যৌবন।

রাজ সিংহাসনে তখন দ্বিতীয় চার্লস। সৌখীন কলারসিক মানুষ। ইংল্যাণ্ডের কোন রাজার এমন ঢেউ খেলানো বাবরী ছিল? এমন এক জোড়া খঞ্জন, পাখীর লেজের মতো অসাধারণ গোঁফ। রাজা বললেন—

ইজ ইট ? উত্তর এল—ইয়েস মাই লর্ড, হিজ হাইনেস। অসাধারণ নাটক। অপূর্ব অভিনয়। চলুন আজ রাতেই একবার দেখে আসি। রাজা বললেন—তা মন্দ বল নি। স্পোর্টস, বিগ গেমস, বেঙ্কোয়েট তো আছেই একটু কালচার একটু সংস্কৃতিও তো থাকা চাই। আমরা জগৎ শাসন করব, ইন্টেলেক্ট ভোঁতা হলে তো চলবে না।

ড্রুরি লেন সেদিন আলোয় আলো। থিয়েটার সাজানো হয়েছে ফুলের স্তবকে। রাজা আসছেন। সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

পরিচালক বললেন—দিস্ ইজ এ রেয়ার প্রিভিলেজ মাই ডিয়ার সারস। দেখো আমার মুখ রেখ তোমরা। রাজা এলেন তাঁর সভাসদদের নিয়ে। হাতে একটি লাল গোলাপ। বসলেন তাঁর নির্দিষ্ট ভেলভেট মোড়া 'বক্সে'। প্রেক্ষাগৃহের আলো ম্লান হয়ে এল—মঞ্চে পর্দা উঠল। তারপর। তারপর মধ্য রাতে রাজা প্রাসাদে ফিরলেন। মুখে কথা নেই। একবার শুধু প্রশ্ন করেছিলেন—মেয়েটি কে? কোন মেয়েটি? ও হ্যাঁ, ওর নাম নেল গোয়াইনে। নেল। রাজার মনে নেলের মতোই অর্থাৎ যেন একটা পেরেকের মতো নেল গেঁথে গেল। বাকিংহাম প্যালেস তখন সুষুপ্তির কোলে। শান্ত্রীদের পায়চারির শব্দ ছাড়া পৃথিবী নিস্তব্ধ। রাজা তখনও বিছানায় যাননি। চুমুকে চুমুকে পান পাত্র শেষ হয়ে এসেছে। বাতিদানে বাতি গলে গলে নিঃশেষ হতে চলেছে। রাজার চোখে ভাসছে নেল, কানে ভাসছে তার সুরেলা গলা। নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

প্রথমে নেল বিশ্বাস করেনি। তাই পরিচারিকাকে বার বার জিগ্যেস করল—কি বললি, কে এসেছে, রাজা। রাজা দ্বিতীয় চার্লস। নেল ভীষণ বিব্রত বোধ করল। তার এই গরিবখানায় স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর। 'প্রবল প্রতাপ সহেনা যার'। তাড়াতাড়ি ঘাসের চটিতে পা গলিয়ে সে বেরিয়ে এল তার শোবার ঘর থেকে। কিন্তু একি? রাজা যে একেবারে দরজার সামনে, মৃদু মৃদু হাসছেন। তাকে প্রায় ঠেলে নিয়েই শোবার ঘরে চলে এলেন। ভরাট গলায় বললেন—'সুন্দরী আমি যে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।' তোমার অপূর্ব

অভিনয় বলতে বলতে বসে পড়লেন খাটের একধারে, পালকের লেপটিকে আলতো আলগোছে সরিয়ে বললেন—তোমার অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে। এই তার সামান্য পুরস্কার। একটি মুক্তোর মালা দু আঙুলে ঝুলছে। নেলের চোখ ঝলসে গেল।

এই মালা আমি নিজে হাতে তোমার গলায় পরিয়ে দিতে এসেছি। আমি তোমার গুণমুগ্ধ, আমি তোমার রূপমুগ্ধ। সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে নেলের তখনও রাতের ঘোর লেগে আছে। তারপর এই আকস্মিক রাজ অতিথি। অতিথির মতোই অতিথি। কুঁড়ে ঘরে চাঁদের আলো। নেল একটু ভয় পেয়েছে। পেতেই পারে। কিন্তু রাজা তখন নিজের ভাবেই আছেন। নেল তাঁর প্রজা। মুক্তোর মালা না পরিয়ে তিনি তার প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থাও তো করতে পারতেন। মঞ্চে তিনি কতটুকু দেখেছেন। নেলের রূপ-যৌবন। ঐ যে শিফনে জড়ানো শরীর। ভোরের ফুলের মতো টাটকা সুন্দর। লম্বা ঘাড়। যাকে কবি বলেছেন মরাল গ্রীবা। দুটো টানা গভীর চোখ, এক মাথা কোঁকড়া চুল। দুটি বুক যেন দুটি কমলালেবু। রাজা বোধহয় এই সবই ভাবছিলেন। রাজাও তো মানুষ।

মুক্তোর মালাটি গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে রাজা নেলকে টেনে নিলেন গভীর আলিঙ্গনে। নেলের শরীর একটু কাঁপল। কিন্তু কত দীর্ঘ রজনী সে এমনি আলিঙ্গন তো কত শত বার পেয়েছে। তারা ছিল নকল রাজা, এক রাতের রাজা। তাই আজ আসল রাজার আলিঙ্গনে সে এত ভীত। এখনও তার সন্দেহ যায়নি। সে স্বপ্ন দেখছে না তো। যে মানুষটি এখন তাকে বিছানায় ফেলে আদরে আদরে অস্থির করছে সে আসল রাজা তো। না স্বপ্ন! কোন ইচ্ছাপূরণের দেবতা কি তার অনেক রাতের ইচ্ছেকে আজ এমনি ভাবেই পূরণ করে দিলেন!

তারপর সেই রূপকথার গল্পের মতোই, ঘুটে কুড়ুনীর রাজপ্রাসাদ হলো। সোনার পালঙ্ক। হাতি শালে হাতি। ঘোড়া শালে ঘোড়া। দাস, দাসী। জুড়ী, গাড়ী। রাজা একদিন গভীর রাতে, আলগোছে নেলের গরম শরীরটি বুকে তুলে নিয়ে বললেন—আর না। এখানে

আর না। আমার তো একটা মান সম্মান আছে। আমি তোমার জন্যে একটি প্রাসাদ ঠিক করেছি। নেল একটি কাবুলী বেড়ালের মতো গড় গড় করতে করতে, রাজার অনাবৃত বুকে মুখ রেখে বলল—কোথায় মহারাজ? সেকি আমার এই ড্রুরি লেনের স্বর্গ থেকে অনেক দূরে? রাজা নেলের সোনালী চুলের উপর দিয়ে দু'বার হাত বুলিয়ে বললেন—না না খুব দূর নয়। জায়গাটার নাম হার্ট ফোর্ডশায়ার। প্রাসাদের নাম তুমি হয়ত শুনে থাকবে 'স্যালিসবেরি হল'। এরপর রাজা যেন কবি হয়ে গেলেন—সে বড় মনোরম জায়গা। কাকচক্ষু দিঘির জলে শান্ত গাছের ছায়া। মন্থর দ্বিপ্রহরে ভ্রমরের গুঞ্জন। জানালায় জানালায় অবাধ আকাশের উঁকি। এর মাঝে তুমি আর আমি। আমি আর তুমি।

রাজা দ্বিতীয় চার্লস ইতিহাসে আমুদে রাজা নামে পরিচিত। সে তো বোঝাই যাচ্ছে। একজন রক্ষিতার জন্যে প্রাসাদ তৈরি করলেন, শহর থেকে দূরে। বাকিংহাম প্যালেস না হোক, স্থাপত্যের একটি অসাধারণ উদাহরণ। বিরাট হল ঘর, চারিদিকে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। দামী দামী মেহগনী আর ওক কাঠের ফার্নিচার। পুরু কার্পেট পাতা। বড় বড় ঘর, বিরাট বিরাট খিলান। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নানা কায়দায় তৈরি একটি রহস্যময় প্রাসাদ। সেখানে নেল একমাত্র কর্ত্রী। রাজা কেবল রাতের অতিথি।

প্রেমের অনিবার্য পরিণতি সন্তান। নেল গর্ভবতী হয়েছে। রাজার বীর্যে তার গর্ভে সন্তান এসেছে। রাজা চেয়েছিলেন শুধু প্রেম। কেউ জানবে না, প্রজা-সাধারণ টের পাবে না, রাজা শুধু ভ্রমরের মতো নেল নামক এক প্রস্ফুটিত ফুলের মধু পান করে উড়ে যাবেন। কিন্তু তা তো হয় না। নেল একদিন হঠাৎ ঘোষণা করল, আমি মা হতে চলেছি। রাজাকে মেনে নিতে হলো এই মাতৃত্ব। যথাসময়ে নেল মা হলেন—একটি ফুট ফুটে রাজকুমার। রাজা চার্লস অকৃতজ্ঞ ছিলেন না—

রাজকুমার বড় হলে, তাঁকে একটি ডিউক বানিয়ে নিলেন—সেন্ট

এলবানের ডিউক। স্যালিসবেরি হল থেকে মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে ডিউকের রাজত্ব। নেলের শোবার ঘরের জানালায় দাঁড়ালে এলবানের গীর্জার চূড়ো দেখা যায়। সব সুখের শেষ আছে। সব ভোগেরই সমাপ্তি আছে। ড্রুরি লেন থিয়েটারের মঞ্চে নাটকের স্থায়িত্ব যখন কয়েক ঘণ্টা আসল জীবন রঙ্গ মঞ্চে নাটক হয়ত সেই তুলনায় একটু দীর্ঘ স্থায়ী, কিন্তু অনন্ত কালের সমুদ্রে জীবনের মুক্তোমালা শুধু সারি সারি বিন্দুর সমষ্টি। শেষ বেলার আলো প্রতিফলিত হচ্ছে আরশিতে। নেল দেখলেন চুলে পাক ধরেছে। ত্বক আর আপেলের মতো মসৃণ নয়, কুঁচকেছে জায়গায় জায়গায়। এসবই তো মৃত্যুর পরোয়ানা। 'যেতে নাহি দিব' কিন্তু কে পারে কাকে আটকাতে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস আর তাঁর নর্ম সহচরী নেল সময়ের ঘষা কাচের ওপারে চলে গেলেন। বিস্মৃতি, বিস্মৃতি, বিস্মৃতির সেই অনন্ত স্রোতে তাঁরা হারিয়ে গেলেন। ১৬৮৭ সালের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, স্যালিসবেরি হলের এক সুসজ্জিত কক্ষে তাঁর জীবন দীপ নিভে গেল।

১৬৮৭ সাল। এখন কত সাল ১৯৫১। এই যে শুরুতেই বললেন এখনও নাকি সেইসব ঘটনা দেখা যাবে—নাটকে নয়, ছবিতে নয়, চর্ম চক্ষে। মাত্র একটি ফোন আর চার গিনির ব্যাপার। ঠিকই বলছি। লণ্ডনে নেমে আপনি গাইড টম করবেটের খোঁজ করবেন। আর ঐ ফোন নম্বরে একটু কথা বলে নেবেন—ভ্যালিয়েন্ট ক্রমশ লিমিটিডের সঙ্গে। এঁরা শীতকালে আরামদায়ক কোচে কোন এক শনিবারে আপনাকে হার্টফোর্ডশায়ারে স্যালিসবেরি হলে নিয়ে যাবেন। সেখানে ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলিকে না পেলেও পাবেন একজন অত্যন্ত অতিথি বৎসল ধনী মানুষকে—শ্রীওয়াল্টার গোল্ডস্মিথ, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, কারুশিল্পের উদ্ধারকর্তা এবং কারু সামগ্রীর বিক্রেতা। সঙ্গে থাকবেন টম করবেট। তিনি বলবেন—হুজৌর ইয়ে শুস্তা—না ঠিক ঐ কথা বলবেন না, ফিস ফিস করে বলবেন স্যার দিস্ ইজ ইওর স্যালিসবেরি—এখানে এখন গভীর রাতে ঐ পর্দাঘেরা ঘরে আপনি নেল গোয়ইনে আর চার্লসের প্রেতাত্মাকে দেখতে পাবেন।

শুনবেন পোষাকের খস খস, কাচভাঙা হাসি। তিনশো বছর হতে চলল—এখনও মায়া কাটাতে পারেন নি। এই প্রাসাদের ইট কাঠ পাথরে তাঁরা জড়িয়ে আছেন। যজাতির মতো হাজার বছর ধরে জরাকে ফাঁকি দেওয়ার কৌশল তাঁদের জানা ছিল না। একটা জীবন বড় সংক্ষিপ্ত সুন্দরী। তাই কি আত্মা এখনও অতৃপ্ত। তাই কি হাল্কা শরীরে সুন্দরী নেল এখনও সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে আসেন রাজার ঘরে।

গাড়ী অনেক এঁকে বেঁকে আপনাকে পৌঁছে দেবে এই ঐতিহাসিক বাড়ী কেন প্রাসাদের সিংহ দরজায়। হাসি মুখে প্রাসাদের বর্তমান মালিক গোল্ডস্মিথ সাহেব আপনাকে বেঙ্কোয়েট হলে নিয়ে যাবেন। সেখানে সপ্তদশ শতকের সেই অত্যাশ্চর্য টেবিলে আপনাকে শেরী পরিবেশন করা হবে। মোমবাতির আলোতে দেখবেন দেয়ালের গায়ে আপনার ছায়া কাঁপছে। একটু শীত শীত করছে! বাইরে বিরাট জলার উপর শীতের কুয়াশা ঘন হয়ে নেমেছে। দেয়ালে ঝুলছে বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র। বিরাট একটি তৈল চিত্র থেকে রাজা দ্বিতীয় চার্লস, কাহিনীর নায়ক, মনে হচ্ছে এখনি নেমে এসে এক পাত্র শেরী টেনে নেবেন। শেরী আপনাকে একটু উষ্ণ করে তুলবে। গোল্ডস্মিথ সাহেব কথায় কথায় আপনাকে এই ভৌতিক প্রাসাদের ইতিহাস শুনিয়ে দেবেন। অনেক, অনেক আগে রোমান আমলে এই প্রাসাদের পত্তন হয়। প্রথম বাসিন্দা একজন স্যাকসন ভদ্রলোক নাম আসগর, ঘোড়ার মালিক। কিন্তু নরম্যান আমলে 'উইলিয়াম দি কনকারার' প্রাসাদটি দান করে দিলেন দ্য ম্যাণ্ডাভিলকে। তারপর সেই চতুর্দশ শতকে মালিকানা বর্তাল স্যালিসবেরির আর্লের উপর। সেই থেকেই এই নাম। এরপর গোল্ডস্মিথ সাহেব আপনাকে একটি আবিষ্কারের কাহিনী শোনাবেন। সে কাহিনী এই শতকের। আশেপাশে কোথায় তিনি ক্রিকেট খেলতে এসেছেন। তার স্ত্রী ঘুরে ঘুরে দেখছেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কার করলেন এই প্রাসাদ যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে

বিস্মৃত ইতিহাস। প্রাসাদটি তিনি কিনে ফেললেন। জরাজীর্ণ একটি একটি ইমারৎ কে তিনি অপরিসীম অধ্যাবসায়ে, পূর্ত বিভাগের সহযোগিতায় একটু একটু গড়ে তুললেন—ঠিক যেমনটি ছিল সেই বিস্মৃত শতাব্দীতে। সপ্তদশ শতকের সেই অবহেলিত, বহু স্মৃতি বিজড়িত প্রাসাদ একটি রত্নের মতো বর্তমান শতকে শোভা পাচ্ছে, আমাদের সামনে ধীরে ধীরে খুলে দিচ্ছে ইতিহাসের পাতার পর পাতা।

এরপর টম করবেট আপনাকে দেখাবে একটি ফিল্ম। ইংল্যণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় ভূত দেখার কাহিনী। ভূত দর্শনের প্রকৃত অভিযান। ইতিমধ্যে রাত গভীর হবে। ছবির ভৌতিক পরিবেশ আপনাকে একটু দুর্বল করবে। পিঠের দিকটা শির শির করবে। বারে বারে ঘাড় ঘোরাতে ইচ্ছে করবে। অবশেষে মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় আপনি রাতের আহার শেষ করবেন। আপনাকে পরিবেশন করা হবে—হ্যাম, বিফ, রোষ্ট চিকেন আর স্যালাড।

এরপর টম করবেট বাতিদানটি হাতে তুলে নিয়ে, সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে আপনাকে নিয়ে যাবেন উপরতলার সেই ঘরে—যে ঘরে নেল জীবনের বহু মধুর রাত কাটিয়েছিলেন—নেলের শোবার ঘর। বাতির আলোয় দেখবেন বিরাট একটি খাট একটি সাদা চন্দ্রাতপের তলায়। ঘরের এক কোণে একটি কাচের আলমারিতে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন—রোমক মুদ্রা, স্যাক্সন আঙটি, নরমান পাত্র, মধ্যযুগীয় চাবি।

এরপর আপনার ফিরে যাবার পালা। ভাগ্য ভাল হলে, আপনার সেই কোমল অনুভূতি থাকলে আপনি হয়ত সেই ঘরে নেলের উপস্থিতি টের পাবেন। হঠাৎ বিদ্যুতের একঝলক আলোর মতো চকিতে সেই বিছানায় দেখবেন—নেল আর চার্লসের প্রণয় মধুর আলিঙ্গন। হয়ত দেখবেন সমস্ত ঘর ভরে গেছে দামী আতর আর প্রসাধনের গন্ধে। শুনবেন পোষাকের খস্ খস্ শব্দ আর খিল খিল হাসি। শুনবেন কে যেন হাল্কা পায়ে ঘাসের চটির শব্দ তুলে তুলে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে

নীচে নেমে চলেছে, নীচে আরো নীচে। গৃহস্বামী ফিস্ ফিস্ করে বলবেন—ঐ শুনুন—নেল চলেছে অভিসারে, নীচে রাজশয়ন কক্ষে।

ফেরার পথে সেই প্রাসাদের বাগানে হয়ত আপনি আরো ছুটি প্রেতাত্মা দেখতে পাবেন। জলার উপর একটি সাঁকোর পরে দাঁড়িয়ে আছে একজন নাইট আর দেখবেন একজন সৈনিকের এফোঁড় ওফোঁড় বর্শা গাঁথা ভীষণ রক্তাক্ত চেহারা।

মাত্র একটি ফোন, মাত্র চারটি গিনি এবং আপনি একটি আরাম-প্রদ কোচে চেপে চলে যাবেন ইতিহাসের এক অতি প্রাচীন অধ্যায়ে। শেরী আর সুখাদ্যে আপনার রসনা তৃপ্ত হবে। বাকিটা নিতান্তই বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার।

৫

নদী আমাদের জীবন। নদী আমাদের ভাব, ভালবাসা, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। নদীতে আমাদের দর্শন, আমাদের কর্ষণ। নদী আমাদের প্লাবন, নদী আমাদের ধরণ-ধারণ। নদী এনেছে পর্যটক, লুঠেরা। নদী এনেছে ধর্ম, নদীর তীরে সভ্যতার সামিয়ানা। নদী প্রেমিকের উদাসীমন, নদী বৃদ্ধের মৃত্যুনামা চোখে পরপারের ইঙ্গিত। নদীতে অবগাহনে পাপস্খালন। নদীতে তীর্থস্নানের অক্ষয় পুণ্য। উৎস থেকে মোহনা, জীবনের মতোই জটিল নদীর প্রবাহপথ। কোথাও গহীন গভীরে, কোথাও চরভূমি, শৃগালের হাহাকার, পলিতে ফসলের উচ্ছ্বাস। কোথাও শাখানদীর মিলনকামনা।

নদীর তীরে শিল্পশহর, জীবনের জলসা। তীর্থ থেকে তীর্থে, সঙ্গম থেকে সাগর মানুষ নদীময়। নদী আছে তাই আছে জীবন। মানুষের চিরকালের কণ্ঠে একই আবেগ—ও নদীরে…। নদী আমাদের মা, নদী আবার ছুহিতা।

নদী আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতার কোল ছুঁয়ে পর্বতের স্নেহ বহন করে নিয়ে চলেছে সুনীল সমুদ্রে। নদী আমাদের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

নদীই এনেছিল একদিন পরাধীনতার গ্লানি। নদীর জল ছুঁয়েই উঠেছিল স্বাধীনতার সূর্য। বিচিত্র ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, মেজাজ আর মনের অখণ্ড মিলনমালা গেঁথে গেঁথে নদী আমাদের প্রবাহের আনন্দ, মিলনের উল্লাস।

পশ্চিম বাংলার ভাগীরথী, দামোদর, অজয়, রূপনারায়ণ, তিস্তা, তোষা, জলঢাকা আরো ছোটো বড় নদী মানুষের প্রযুক্তির হাতে পড়ে অর্থনীতির বাধ্য সন্তান। নদীর তোমার কাছে কোটি মানুষের অজস্র দাবী

আমরা সেচের জল চাই। প্লাবন চাই না।

তোমার শক্তির কাছে ভাঙ্গন চাই না, চাই আমাদের শিল্পশক্তি বিদ্যুৎ।

তোমার কাছে মৎস্যবিলাসী বাঙালী চায় সুস্বাদু মাছ।

নদী তুমি আমাদের বন্দর রাখো। তুমি আরো জীবিকা দাও। আমরা তোমাকে কি দোবো! কিছু ফুল প্রদীপের টিপ, আর দোবো শিল্পশহরের যত আবর্জনা আর মলিনতা।

জলসা ঘরের নায়কের মতো, ঝুলঝাড়া দিয়ে ঝাড়লণ্ঠনের ঝুমকো-গুলোকে টিং লিং করে নাড়িয়ে দিয়ে বিশ্বরূপ বললে, ঘোড়া আর এই গঙ্গা, এই পরিবারের সর্বনাশ করে দিলে। দুটোরই চরিত্র এক। দিতেও পারে আবার নিতেও পারে। এই বত্রিশ বছরে মা আমার দু লক্ষ টাকা গিলে বসে আছেন। অবশ্য ঘোড়ার পিছনে উড়েছে আরো বেশী। যে ঘোড়াটার পেছনে ফাদার সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছিলেন সে ব্যাটার নামও ছিল রিভার। বিশ্বরূপ গুনগুন করে গান গাইল, শ্যামাপদে আশ নদী তীরে বাস, কখন কি যে ঘটে ভেবে হই মা সারা। নীলকণ্ঠের পরের লাইনটাও বল, এককূল নদী ভাঙ্গে নিরবধি, আবার অন্যকূলে আকুলে সাজায়। বিশ্বরূপ হাসল, তাতে আমার লাভটা কি? পশ্চিম দিকটা সাজালে হামারা কেয়া হোগা। আমার পূব দিকটা তো বিলকুল হজম হয়ে গেল রে!

এই সেই জমিদার বাড়ি। কার্পেটের মতো ঢালাও লন উঁচু পোস্তার

ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে সাদা রেলিং ধরে একসময় গঙ্গার দিকে ঝুঁকে থাকতো। দু-কোণে ছিল দুটো সৌখীন জলটুঙি। একদিকে গঙ্গা অন্যদিকে প্যাভিলিয়ানের মতো লাইব্রেরী। ইতালি থেকে আনানো সাদা আর কালো মার্বেল পাথরের মেঝে। নীচু সোফায় বসে বই পড়তে পড়তে পশ্চিমে তাকাও। রিয়েল লাকসারি। সবুজ লন, গেরুয়া গঙ্গার জল কুলুকুলু ছুটছে। উপুড় হয়ে আছে নীল আকাশ। দূর পারে মন্দিরের ত্রিশূল বিঁধে আছে আকাশের গায়ে। লনে টেনিস খেলা হতো, ব্যাডমিন্টন। জিমনাসিয়াম ছিল একপাশে। সেই লন আজ নিশ্চিহ্ন। জলটুঙির থামগুলো জলের তলায় সমাধিস্থ। বিশ্বরূপের গৃহশিক্ষকদের জন্যে নির্দিষ্ট দোতলা ফ্যামিলি কোয়ার্টার নদীগর্ভে। ছোটো ছোটো পাথর বসানো স্নানঘাট ভেঙ্গে চুরমার। নিয়ে যাও সব নিয়ে যাও। তোমাকে দেবার জন্যে বসে আছি আমি এক রাইচরণ।

তবু পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতি। ওই তো সেই ঘাট। শ'দেড়েক বছর আগেকার পদচিহ্ন পড়ে আছে। জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যান করছেন। একটি নৌকো আসছে দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে। আরোহী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। নৌকো ভেড়াও ঘাটে। জয়নারায়ণকে একটা চড় মারতে হবে। আহ্নিকের সময় বিষয়চিন্তা করছে। সেই ঘাট আছে। সেই নদীও আছে। কেবল সমান্তরাল আর একটি নদী, সময়ের স্রোতে চরিত্ররা অনবরতই ভেসে চলেছে, বর্তমান থেকে অতীতে। নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? বিজ্ঞানীর সেদিনের সেই বিখ্যাত প্রশ্নের উত্তর হয়তো এইরকম, ভবিষ্যতে হইতে, বর্তমান হইতে অতীতে।

'লাভ দিস রিভার, স্টে বাই ইট, লার্ন ফ্রম ইট।' ভালবাস নদীকে, বাস কর নদীর তীরে, নদীই তোমার গুরু। জীবনের শেষ প্রান্তে হেরম্যান হেসের "সিদ্ধার্থ" নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সেই চরম সত্যকে উপলব্ধি করল—'হু এভার আণ্ডারস্টুড দিস রিভার এণ্ড ইটস সিক্রেটস উড আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মাচ মোর, মেনি সিক্রেটস, অল সিক্রেটস।' এই

নদী, এই নদীর গোপন তথ্য যার বোধগম্য হয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত রহস্য তার কাছে পরিষ্কার। 'হি স ছাট দি ওয়াটার কনটিন্যুয়ালি ফ্লোজ্ এণ্ড ফ্লোড্ এণ্ড ইয়েট ইট ওয়াজ অলওয়েজ দেয়ার। ইট ওয়াজ অলওয়েজ দি লেস এণ্ড ইয়েট এভরি মোমেণ্ট ইট ওয়াজ নিউ': প্রতি মুহূর্তে যার নতুন জীবন, অস্তিত্বে যে প্রবাহিত, একই মুখে যার অসংখ্য মুখ, সেই নদী আমাদের জীবন-দর্শনের' সবচেয়ে বড় দর্শন, জীবন ধারণের সবচেয়ে বড় ধরণ।

নদী তোমাকে কি বলছে কান পেতে শোনো—জীবনের দেনা-পাওনার হিসেব যখন মিলবে না—চলে এস আমার তীরে পর্ণকুটিরে, আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমাকে বক্তা থেকে শ্রোতা করে তুলবো। সব জানি আমি, শান্ত হয়ে বসো, পাঠ গ্রহণ কর আমার কাছে। আমার নিম্নাভিমুখী গতির সঙ্গে তোমার জীবনের গতি মেলাও, ডুবে যাও, তলিয়ে যাও আমার গভীরে। আমি সেই অনন্ত কালের বাউল, আমার চলার ছন্দে সেই সঙ্গীত।

'ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন তলাতল খুঁজলে পাতাল
তলাতল খুঁজলে
পাতাল পাবিরে সেই কৃষ্ণধন'

নদী কি তোমাকে· শেখাতে পারে নি—সময় বলে কিছু নেই? একই সময়ে আমি সর্বত্র প্রবাহিত। আমি গোমুখীতে। আমি উৎসে আমি প্রপাতে। আমি পারাপারের ঘাটে। আমি স্রোতে। আমি সমুদ্রে। আমি পর্বতে। আমি সমতলে। বর্তমান তাই আমার ধর্ম। অতীতের ছায়া আমাতে প্রলম্বিত নয়। ভবিষ্যৎ আমাতে দীর্ঘায়িত নয়। কাল আমাতে স্তব্ধ।

'শোন্ চলচল্ ছলছল্ সদাই গাহিয়া চলেছে জল।
ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে, ওরা কার কোলে বসে দুলে?'

দার্শনিকরা যাই বলুন না কেন, নদীরও কিন্তু যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য আছে। তরুণ নদী প্রাণশক্তিতে ভরপুর। অসংখ্য ধারায় তার আরোহণ, অসংখ্য ঢালে সে বেগবান, উদ্দাম শক্তির ঐশ্বর্যে সে

ঐশ্বর্যশালী। সেই প্রবাহের শক্তিতে যেমন প্লাবনের ক্ষমতা আছে তেমনি ভাঙনের ক্ষমতাও আছে। চলার পথে তরুণ নদী ত্রিভুজা আকৃতির উপত্যকা সৃষ্টি করে। দু কূলের ব্যবধান তখন খুবই কম। যেন হাতে হাত রেখে চলা। সেই নদী যখন বয়সে আর বিস্তারে পরিপূর্ণ, তখন সে প্রৌঢ়। আর প্রগল্‌ভতা নয়। সর্পিল আকারে এঁকে বেঁকে চলাই তখন তার ধর্ম। সে চলার ছন্দে তৈরি হবে ইংরেজী ইউ হরফের আকারে বিস্তীর্ণ উপত্যকা। কখন সে ভাঙবে কখন সে ফেলবে পলি। খুশির খেয়ালে সে কখন গভীর কখন অগভীর। নদী যখন স্থবির তখন সে পাহাড়ী পথের চপলতা হারিয়েছে। আর তো পারি না। ধীর, মন্থর তার গতি। সে তখন সমতলে প্রবাহিত। শক্তি নেই স্নায়ুতে—তাই যা কিছু বহন করে এনেছে সব শিথিল মুঠো থেকে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে। সামনে তার সমুদ্রের আহ্বান। তবু যাবার আগে দিয়ে যেতে চাই যা এনেছি সঙ্গে করে। এই নাও চরভূমি। পলির স্বাদ নোনতা। ফলাও ফসল। এই নাও ব-দ্বীপ। গড়ে তোলো জনপদ। আমার মহাপ্রয়াণের পথে জ্বলে উঠুক তোমাদের জনপদের দীপমালা।

'নদী কোথা হতে এল নাবি,
কোথায় পাহাড় সে কোন্‌খানে ?
তাহার নাম কি কেহই জানে ?
কেহ যেতে পারে তার কাছে ?'

গিরি জননীর নিভৃত সূতিকাগৃহে আমার জন্ম। যৌবনের চলার পথে ছড়ানো নিঃসঙ্গতা। এখন আমাকে তোমার সঙ্গ দাও। জীবনের বিচিত্র বাসরের মধ্য দিয়ে পথ করে সাগরে মিশে যাই। নদী তুমি বৃদ্ধ :

Wild river in the cataract far-murmured and
rash rapids to sea hasting
Far now is that birth-place mid abrupt mountains
and slow dreaming of lone valleys.

একই অঙ্গে যার যৌবন, আর জরা তারই আশ্চর্য নাম নদী। পৃথিবীর তাবৎ বিশাল নদীরই এই এক ধর্ম। মিসিসিপি। গঙ্গা। গঙ্গে তুমি পূণ্যতোয়া। তুমি সুবিশালা। প্রদেশ থেকে প্রদেশে প্রবাহিতা। তুমি শাক্তের, তুমি শৈবের, তুমি বৈষ্ণবের। তবু পৃথিবীর নদী বর্ণমালায় তোমার স্থান নেই। তোমার অন্য সহোদররাও স্থান পায়নি। সেখানে সবার উপরে—অ্যামাজোন—যার প্রবাহপথের দৈর্ঘ্য ৩৮৫৪ মাইল। এরপর আছে নীলনদ, ইয়াঙ্গৎসি, কঙ্গো, হোয়াংহো, নাইগার, ম্যাকেঞ্জি, পারানা, ইউকোন, কোলোরোডা, সেন্ট লরেন্স, রাইন. ডেনিয়্যুব, হাডসন। গঙ্গা ১৫৬০ মাইল। নীলনদ দৈর্ঘ্যে গঙ্গার দ্বিগুণ। অ্যামাজোনও তাই। এমনকি মিসিসিপি-মিসৌরি, ইয়াঙ্গৎসি, এমনকি ডেনিয়্যুবও দৈর্ঘ্যে গঙ্গার চেয়ে বড়। তাতে কি যায় আসে? তুমি পুরাণে, তুমি বর্তমানে। একদা সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের জীবন দান করেছিলে, আজ তুমি আধুনক শিল্প জীবিকার পথ প্রশস্ত করে হাজার হাজার মানুষের জীবনে প্রবাহিতা। তুমি বন্দরে নাবিকদের স্বপ্ন, তুমি জল সিঞ্চনে কৃষিতে পূর্ণ। তোমাতে উদয় তোমাতে অস্ত। তুমি ধর্মে, তুমি সাহিত্যে. তুমি কাব্যে। তোমাতে অবগাহনে পাপমোচন, তোমাতে অঞ্জলি ভরে তৃষ্ণা নিবারণ। তোমার জলে আজ শিল্প দূষণ। ৪৩ কোটি হিন্দুর তুমি পবিত্র জননী।

পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী গঙ্গে
খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে
ভীষ্ম জননী খলু মুনিবরকন্যে
পতিতোদ্ধারিণী ত্রিভূবন ধন্যে।

গাড়োয়াল হিমালয়ের বারো হাজার ফুট উঁচুতে সেই দুর্গম মহাতীর্থ অভিযাত্রীদের বিজয়ের স্বপ্ন, গঙ্গোত্রী হিমবাহ। সেই হিমবাহের পাদদেশে প্রকৃতির বিস্ময়কর খেলা। মানুষের কত সহস্র বছরের কল্পনার চোখে দেখা একটি গোমুখ। সেই গোমুখী নিঃসৃত সধূম গঙ্গার উৎসমুখের নাম ভাগীরথী। ভক্তজনের মুদিত নয়নে এখনো সেই দৃশ্য—ভগীরথ শাঁখ বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছেন।

মকবাসীনা। গঙ্গা তাঁর পশ্চাতে। প্রাচীন সে কাহিনী কার অজানা!
বৈষ্ণব বলবেন বিষ্ণুর পদাঙ্গুলি থেকে নির্গত হয়েছেন দেবী গঙ্গা।
উত্তর ভারতের ধ্রুপদিয়া আকাশ রাঙানো উষায় ভৈরোঁতে গাইবেন—

বিষ্ণু চরণজল

ব্রহ্মাকে কমণ্ডলু দেবী গঙ্গে।

ভারতের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে, পর্বত গুহায় শিবের গঙ্গাধর মূর্তি পাওয়া গেছে। শিব তাঁর জটার একটি গুচ্ছ থেকে পেছন দিকে ডান হাত বাড়িয়ে মা গঙ্গাকে ঝেড়ে ফেলছেন—অন্য হাতে উমার চিবুক ধরে আদর করছেন। লক্ষ্মীটি হিংসে কোরো না। শিবের দুই স্ত্রী—উমা আর গঙ্গা, হিমালয়ের সঙ্গে শিব চিরকালই জড়িত। শিবের সঙ্গে গঙ্গা। ভারত এবং ইরান এই চিন্তায় পরস্পর প্রভাবিত। ইরানের পুরানে বলছে—অনাহিতা গঙ্গার মতোই স্বর্গীয় নদী। পৃথিবীতে যার জুড়ি অকসাস—সে নদী নেমে আসছে—আর্বুজ-হারা-বেজজাইতি পর্বত থেকে। অনাহিতার সঙ্গে মিথরার যে সম্পর্ক—গঙ্গার সঙ্গে শিবের সেই সম্পর্ক।

বেদে যে সমস্ত স্বর্গীয় নদীর উল্লেখ আছে—সরস্বতী তাদের মধ্যে একটি। ঋগ্বেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে গঙ্গার উল্লেখ আছে কত নামে: অলকানন্দা, দ্যুধুনি, দ্যুন্দি, মন্দাকিনী, ভাগীরথী, জাহ্নবী। পুরাণে নদী হলো হোমকুণ্ডের জননী। বেদের আর্যদের দুর্গম পদযাত্রা ছিল নদী অনুসারী। যজ্ঞাগ্নির স্পর্শে অরণ্য ভস্মীভূত। করে গড়ে উঠেছিল আর্য উপনিবেশের পর উপনিবেশ। আর্য সভ্যতার প্রসার ছিল নদীবাহী। সাতটি নদী উপত্যকায় পড়েছিল আর্য প্রভাব—সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী—আমাদের প্রধান সাতটি নদী—ভারত সভ্যতার পীঠস্থান। আর্য এবং অনার্য সভ্যতার আদান প্রদানে গড়ে ওঠা প্রাচ্যভূমি। আর্যদের নদীমাতার সঙ্গে অনার্য মহাদেবের মিলন।

গঙ্গোত্রী থেকে তিনশো মাইল নেমে এসে, গঙ্গা শিবালিক পর্বত

শৃঙ্গ থেকে মুক্ত হলেন হরিদ্বারের সমতলে। বৈষ্ণবের হরির দ্বার শৈবের হরিদ্বার। হিন্দুর মহাতীর্থ। মা গঙ্গার সমতলে উত্তরণ। পুরাণের মতে গঙ্গা নেমেছেন মহাদেবের জটা থেকে সাতটি ধারায়। গঙ্গোত্রীর একশো মাইল দূরে কেদার। সেখান থেকে নামছেন মন্দাকিনী। বদরীনাথের দক্ষিণ-পশ্চিমে নন্দাদেবীর পাশ থেকে মুক্ত হয়েছেন ঋষিগঙ্গা—যুক্ত হয়েছেন ধবলগঙ্গায়। তারপর দুই বোনে গিয়ে পড়েছেন যোশী মঠের কাছে অলকানন্দায়। দেব-প্রয়াগের কাছে অলকানন্দা মিশলেন ভাগীরথীতে। ভাগীরথী এইখানে হলেন গঙ্গা।

হিমালয় থেকে সাগর, গঙ্গার এই বিশাল প্রবাহপথ যে সমতলে—সেই সমতল ভারতের একটি সুবিশাল উপত্যকা—যার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত। চার লক্ষ বর্গমাইলের একটি অববাহিকা। সবচেয়ে চওড়া অংশের দৈর্ঘ্য দুশো মাইল। হাজার মাইলের সমুদ্র যাত্রায় গঙ্গা উচ্চতায় নেমে এসেছে ৭৫০ ফুট। তিনটি প্রদেশের ১৯ কোটি মানুষের জীবনে এই গঙ্গা অমৃতধারা।

তবর্তট নিকটে যস্য হি বাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।

সারা ভারতের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই তিনটি রাজ্যে—উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আর পশ্চিমবঙ্গ।

হরিদ্বারের কাছে মা গঙ্গাকে মানুষের সেচবিজ্ঞান কৃশ করে দিয়েছে। শক্তি হরণ করেছে। গঙ্গা অতঃপর ক্ষীণতোয়া। ভিকটো-রিয়ার আমলের বাস্তুকারেরা বাঁধ তৈরি করে তিনের চার ভাগ জল টেনে নিয়েছেন। খরা আর দুর্ভিক্ষপীড়িত দোয়াবে সেই জলে ফসল ফলছে। গঙ্গা আর যমুনার মধ্যবর্তী এই দোয়াব আজ সম্পন্ন কৃষি এলাকা। হরিদ্বারের পর পরবর্তী একশো মাইলের যাত্রাপথ অতি নিঃসঙ্গ। ডান দিকে তার নীচু জলা জমি। লম্বা ঘাসে শুধু হাওয়ার দুলুনি। বর্ষায় দুর্গম। বাঁদিকে গহন অরণ্য থাকে থাকে উঠে গেছে

হিমালয়ের কোলে। শিবালিক পর্বত থেকে নেমে এসেছে পাথরের চাঙড়া শিলা খণ্ড। উপলভূমির উপর নদীর নৃত্য।

তরুণী গঙ্গা এর পরের যাত্রাপথে প্রবীণা। শান্ত, ধীর। অনবরত পরিবর্তনশীল যার গতি। শীর্ণ। ধারা থেকে উপধারার গতি উদ্দেশ্যহীন। গ্রীষ্মে জলে পা ডোবে কি ডোবে না। শীতে শুধুই স্মৃতি। শীতে যার দুই তটের দৈর্ঘ্য আধ মাইলের বেশী নয়—বর্ষায় সেই নদী কূলহীন অনন্ত। দীর্ঘ বিশ মাইলের পারাপার। শীতের শুকনো নদী বর্ষায় তিরিশ ফুট গভীর। ঐতিহাসিক শহর, পুণ্য তীর্থভূমি দু পাশে রেখে এলাহাবাদ থেকে ছশো মাইল নীচে রাজমহলের কাছে গঙ্গা বাঁক নিয়েছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। সাগরের দিকে গঙ্গার সবচেয়ে বড় মোচড়। এই সেই 'বেণ্ড অফ দি গ্যাঞ্জেস।' এই নামে মনোহর মূলগাঁওকরের একটি বিখ্যাত উপন্যাস আছে। ৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলেছে গঙ্গার বাঁকে। আর্যদের আদি উপনিবেশের যজ্ঞানল নয়। অনার্যসুলভ অসভ্যতার দাবানল। এই সেই বেণ্ড অফ দি গ্যাঞ্জেস যেখানে গঙ্গার স্বচ্ছ জলধারা ঘোলাটে হয়েছে। একদিকের পাড় বিশ থেকে ত্রিশ ফুট উঁচু, আর একদিকের নীচু। কাদা আর বালির ছোট ছোট ধাপ জলে ধুয়ে আসছে ঘোলাটে কাদা, চিক চিক করছে অভ্রের দানা, মেয়েদের নাকের নাকছাবির মতো। মোহনা পর্যন্ত প্রবাহিত এই হলুদ বর্ণ ঘন স্রোত যেন গলন্ত সোনা। রাজমহলের কাছ থেকে গঙ্গা প্রতি মাইলে এক ফুট করে ঢালু হতে শুরু করেছে। এই বাঁকের কাছে সেকেণ্ডে ১০ লক্ষ কিউবিক ফুট জল ছ নট বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। জোয়ারের মিসিসিপি কিম্বা টেমসের জল নিকাশের চেয়ে ১৫০ গুণ বেশী।

রাজমহল। বাংলার নবাবী বিশ্বাসঘাতকদের শেষ ঘাঁটি। নদীই তার সাক্ষী। ১৫৯২ সালে রাজমহলের নাম ছিল আগমহল। আকবরের রাজপুত্র সৈন্যাধ্যক্ষ মানসিংহ নাম পাল্টে রাখলেন রাজমহল।

রাজমহল হলো বাংলার শাসন কেন্দ্র। ১৬০৭ সালে ইসলামখান রাজধানী বসালেন ঢাকায়। ১৬৩৯-এ সুলতান সুজা রাজ্যপাট তুলে আনলেন রাজমহলে। ১৭০৭ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজমহল থেকে সব সরিয়ে আনলেন মুর্শিদাবাদে। ডানাভাঙ্গা জটায়ুর মতো রাজমহল মুখ থুবড়ে পড়ে রইল গঙ্গার ধারে। ১৮৬৩ সালে গঙ্গাও রাজমহল ছেড়ে চলে গেল তিন মাইল দূরে। এইখানেই শেষ শয্যায় শুয়ে আছে সিরাজের ঘাতক মীরজাফর পুত্র বজ্রাহত মীরন। ইতিহাসের রক্তাক্ত খেলা শেষ হতেই ১৯২৯ সালে গঙ্গা আবার ফিরে এল রাজমহলে। রাজমহলের তখন আর কোনো গ্ল্যামার নেই। নির্বাপিত ইতিহাস। কিছু পেট-রোগা মানুষের উদর মেরামতের জায়গা।

প্রয়াগের সঙ্গমে একদা রাজা-মহারাজারা আত্মাহুতি দিতেন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম, পাপহারিণী, ত্রিভুবনতারিণী। বৈদিক পণ্ডিত কুমারিল্ল ভট্ট একদিন এখানেই দেহ বিসর্জন করেছিলেন। তারপর যুগ থেকে যুগান্তরে সেই প্রথা এগিয়ে গেছে। সেই বিশাল বটবিটপী তলে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে মুক্তিকামী মানুষের অস্থি। প্রয়াগের এই অক্ষয় বটের বিবরণ পর্যটক হিয়ুয়েন সাং লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই প্রয়াগে চতুর্বেদ উদ্ধারের আনন্দে ব্রহ্মা করেছিলেন অশ্বমেধ। তিন বোনেরই জন্ম হিমালয়ের কোলে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। তান্ত্রিক বলবেন, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। হাজার মাইল অবরোহণের পর আবার তিনজনের মিলন। উত্তর থেকে এলেন গঙ্গা। প্রস্থে দেড় মাইল, অগভীর, গৈরিক জলধারা, বেগবান। যমুনা এলেন পশ্চিম থেকে। প্রস্থে আধ মাইল। গভীর নীল জলধারা। আর এলেন পুরাণোক্ত সরস্বতী। নীল আর গেরুয়া মিলে-মিশে একাকার। প্রতি বারো বছরে এই ত্রিবেণী সঙ্গমের কুম্ভ মেলা, মুমুক্ষুর স্বর্গ কামনায় সার্থক—

> তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
> পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।

বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র আশী মাইল দূরে ভাগীরথী তার মূল

প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে পঞ্চদশ শতকে রাজমহল থেকে গঙ্গার পূর্ববাহী গতি গৌড়, পাণ্ডুয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু ভাগীরথীর খাতে গঙ্গার দক্ষিণ ধারা ক্রমশ অবলুপ্ত হতে চলল। নদী খুঁজে নিল দক্ষিণ-পূর্বে আর একটি ধারা। গঙ্গা মিশে গেল পদ্মায়।

বিশাল দুটি রাজ্য অতিক্রম করে গঙ্গা এখন ভাগীরথী নামে প্রবেশ করল পশ্চিম বাংলায়। এখন তাঁর মাতৃভাষা বাংলা। এই সেই বাংলা। যার ঐশ্বর্যের খ্যাতি পুরাণে রয়েছে। অযোধ্যাপতি দশরথ তাঁর দ্বিতীয়া মহিষীর মানভঞ্জন করছেন, ভূভারতের সমস্ত ঐশ্বর্য মহিষী তোমার পদতলে রাখব, বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো শুধু একটু হাসো,—

দ্রাবিড়াঃ সিন্ধু সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণা পথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশী কোশলাঃ ॥
তত্র জাতং বহু দ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ্ব কৈকেয়ি যদ যত্বং মন সেচ্ছসি ॥

প্রাচীন ইতিহাস বলছে, বঙ্গ এক বৈচিত্র্যময় ভূভাগ। এর সর্বত্র বহে চলেছে উদ্দাম স্রোতস্বিনী। সেগুলির জলরাশি ভূভাগটিকে বৎসরের কয়েক মাস জলমগ্ন করে রাখে। শক্তি সঙ্গম তন্ত্রে গৌড় আর বঙ্গের উল্লেখ আছে এই ভাবে :

রত্নকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব সিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥
বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড় দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব বিদ্যা বিশারদঃ ॥

এসব বহু যুগ আগের কথা। এর পর পাঠান এসেছে। মোগল এসেছে। এসেছে ইংরেজ। অনবরতই সীমানার অদল-বদল। রাজ্য গঠন, পুনর্গঠন। কাটাকুটি, ছারখার। তবু নদী তো কোন বাধা মানে না। সমস্ত শাসনের উর্ধ্বে। তার গতি, প্রকৃতি, ভাঙা, গড়া মানুষের তন্ত্র মানে না। উত্তর ভারতের প্রধান দুটি নদী—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। সিন্ধু নদের অববাহিকার সবটাই পশ্চিম পাকিস্তানে। ব্রহ্ম-

পুত্রের সমভূমির তলার দিকের সবটাই বাংলাদেশে। ভারতের উত্তর সমভূমি গঙ্গারই দান। সঙ্গে আছে বামাবর্ত উপনদী—রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী, মহানন্দা। দক্ষিণের উপনদী যমুনা, শোন, চম্বল, বেতোয়া।

মালদার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়ে পশ্চিম বাংলায় গঙ্গার প্রবেশ। কিছু পথ চলেই প্রধান শাখা পদ্মা হয়ে চলে গেল বাঙলাদেশে। দ্বিতীয় শাখা নেমে এল দক্ষিণে। মুর্শিদাবাদে, নবাবী ব্যাভিচার দেখেছে নবদ্বীপে দেখেছে চৈতন্যের অভ্যুদয়, পলাশীর আম বাগানে সূর্যাস্ত দেখেছে, চন্দননগরে ফরাসী স্ট্র্যাণ্ড দেখেছে, ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসকে দেখেছে রামায়ণ রচনায়, হালিশহরে রামপ্রসাদকে দেখেছে অবগাহনে, রামকৃষ্ণকে দেখেছে দক্ষিণেশ্বরে। হুগলীর বুকে দেখেছে চার্ণকের নৌকো। কলকাতার ঘাটে দেখেছে হুতোমের বাবু কালচার। বোতল বগলে পানসির ছাদে বাঙালীবাবুর বিসর্জনের নাচ।

নদী আমাদের ভাষা, নদী আমাদের সংস্কৃতি, নদী আমাদের ধর্ম, নদী আমাদের কৃষি, শিল্প, অরণ্য, স্বাধীনতা, পরাধীনতা। সমুদ্র আর নদীর বেষ্টনীতে আমরা মৌসুমি এলাকার মানুষ। পৃথিবীর প্রাচীনতম দুটি সভ্যতার জন্মভূমি। এই মৌসুমি অঞ্চল। একটি সিন্ধু সভ্যতা অন্যটি উত্তর চীনের হুই-হো অববাহিকার সভ্যতা। নদীর ধারেই মানুষের প্রথম বসতি। সভ্যতার হাতে-কলমে শিক্ষা। প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার। জমি কামড়ে যাযাবর বৃত্তির অবসান। নদীকে অবলম্বন করেই আমাদের ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র। অভিজ্ঞতার উপলব্ধি। মৌসুমী অঞ্চলের জীবনের কি কি বৈচিত্র্য :

(১) অতি প্রাচীন, অতি স্বতন্ত্র, সু-উন্নত সভ্যতার পীঠস্থান।
(২) স্ব-নির্ভর, স্বয়সম্পূর্ণ কৃষি ভিত্তিক জীবন।
(৩) বিশাল এবং দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা।
(৪) ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট।
(৫) অর্থনীতির স্বাভাবিক দুর্বল বিকাশ।

ইতিহাসের পুরনো পাতায় যেতে পারেন ঐতিহাসিক। হুগলী নদীর ভাঁটার টানে ফিরে আসছে চার্ণকের নৌকো। ১৬৮৭ সাল। ১৬৪২ সালে স্থাপিত হয়েছিল ইংরেজদের প্রথম ফ্যাকট্রি। ১৬৮৬তে তিনটি গ্রাম, সুতানুটি গোবিন্দপুর, আর কালিপুরের মুখে তারা ফিরে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এলেন—সেই মার্শি, সোয়াম্পি ল্যাণ্ডে—হুইচ ইজ আনফিট ফর হিউম্যান হ্যাবিটেশান। ভাগ্যের আকর্ষণ নদীর আকর্ষণের চেয়ে বেশী। শা-এন-শা ঔরঙ্গজীবের প্রপৌত্র আজিম-উশ-শান, হুগলীর এই তিনটি জলা জায়গা তুলে দিলেন ইংরেজ বণিকের হাতে। তারপর ইতিহাসের সেই অপ্রতিরোধ্য গতি। একশো বছরের ব্যবধানেই ভিত নামলো ফোর্ট উইলিয়ামের। ১৭৫৮ সাল। ৮১ সালে তৈরি হল দুর্গ। খরচ হল ২০ লক্ষ স্টার্লিং। ৫ লক্ষ স্টার্লিং খরচ হল ভাঙনের হুগলীর পাড় বাঁধাতে। তার আগেই ঘটে গেছে পলাশী। হায় পলাশী। ২৩শে জুন। সাল ১৭৫৭।

এর আগে নদী তুমি বাংলার সমাজ-জীবনে এই সব কাল দেখেছো :

চর্যাপদের কাল, গীতগোবিন্দের কাল, বাংলা পুরাণের কাল, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কাল, কৃত্তিবাসের কাল, শ্রীচৈতন্যের কাল। এইবার এল অবক্ষয়ের কাল। অবক্ষয় থেকে এল মন্বন্তর। শকুন উড়ল দিকচক্র-বাল আচ্ছন্ন করে। তুমি দেখলে বঙ্কিমচন্দ্রকে। ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখলে ফোর্ট উইলিয়ামে। পেলে বন্দেমাতরমের উজ্জীবন মন্ত্র। দেখলে ৪২ সাল। ৪৬-এর শব তুমি বহন করেছ।

স্বাধীন ভারতে নদীর ধারা অর্থনীতির ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অ্যাফরেস্টেশান, ডিফরেস্টেশান, ড্যাম, এমব্যাঙ্কমেণ্ট, ডাইকস, ইরিগেশান, ইনল্যাণ্ড ওয়াটরওয়েস, ডি সিলটিং প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে নিতান্ত লে ম্যানও আজ পরিচিত। ভূমিক্ষয় বোধ কর। পতিত জমিকে ফেল লাঙ্গলের মুখে, খরা বাঁচাও, দুর্ভিক্ষকে বল গুড বাই। কৃষি আর শিল্পের নতুন বুনিয়াদ গড়ে তোলো। যারা বাঙ্গালীকে কাঙ্গালী করেছিল তারা তক্ত তাউস ছেড়ে গেছে। নদী তুমি এখন

আমাদের নতুন দিনের স্বপ্ন। পৃথিবীর মানুষ আমাদের প্রগতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে, কারণ—দি ইন্দো-গ্যানজেটিক প্লেন স্ট্যাণ্ডস আউট অ্যাজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্‌পরট্যাণ্ট লোল্যাণ্ড এরিয়াস ইন দি ওয়ার্ল্ড।

গঙ্গা যদি সুখের নদী হয়, দুঃখের নদীর নাম দামোদর। গঙ্গা আমাদের বরফের নদী। হিমবাহ হল এই নদীর জলাধার। দামোদর হল বৃষ্টির নদী: ছোটনাগপুরের ২ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উৎস দামোদর নামছেন। ইনি নদী নন, নদ। প্রকৃতিতে ম্যাসকুলাইন, স্বভাবে দুর্দান্ত। চরিত্রে, অবিশ্বাসযোগ্য। বিহারের মধ্যে দিয়ে এর ১৮০ মাইল চলা শেষ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এসে। নদীটি নেমে এসেছে পাহাড়ের গা বেয়ে দু মুখো সাঁড়াশীর মত দুটি ধারায়। ২৬ মাইল পাহাড়ের পথ পেরিয়ে হাজারিবাগ জেলায় এসে একটি প্রবাহে পরিণত হয়েছে। জেলার বুক চিরে পূর্বমুখী এই নদী টেনে নিয়েছে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত বোকারো কোণার এবং অন্যান্য শাখা নদীর ধারা। এর পর যাত্রাপথে প'ড়েছে মানভূম জেলা। মানভূম থেকে বেরিয়েই মিশেছে এর প্রধান শাখা উত্তর থেকে আগত বরাকর নদীর সঙ্গে। এই মিলিত প্রবাহ তখন প্রকৃতই নদ। বিশাল তার ব্যাপ্তি, দুর্দান্ত তার গতি, অসম্ভব তখন তার শক্তি। এই বিশাল নদী তখন দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে প্রবেশ করেছে বাঁকুড়া জেলায়। বাঁকুড়া থেকে গেছে বর্ধমানে। বর্ধমান শহরের কাছাকাছি এসে নদী হঠাৎ দক্ষিণমুখী হয়েছে হুগলী নদীর আকর্ষণে। হুগলী আর হাওড়ার মধ্যে দিয়ে কিছু পথ অতিক্রম করে কলকাতা থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে নদ মিলেছে নদীতে। কবি বলছেন—

'বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ, ক্ষীরসম স্বাদু নীর।'

সাধারণ মানুষ বলে অন্য কথা।

দামোদর আমাদের ভাঙ্গনের নদী, প্লাবনের নদী। ভারতীয় নদীর দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দামোদরে প্রকট। গতিপথের প্রথম দিকে

এই নদী মাটি খেয়ে খেয়ে চর ধসিয়ে খরবেগে বয়ে চলেছে। অথচ যখন নীচের দিকে নেমে এসেছে তখন মন্থর গতি, বন্যা প্রবণ। ছুপাশের পাড় বারে বারে ভাঙছে। দামোদরের প্রবাহপথ ৩৩৬ মাইল। ছুটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। সাড়ে আট হাজার বর্গমাইল। এলাকায় জলধারা নিয়ন্ত্রণের শক্তি রাখে এই নদী। উপরের উপত্যকার গড়পড়তা বাৎসরিক ৪৭ ইঞ্চি বৃষ্টির সবটাই প্রায় বুকে করে প্রবাহপথের ছুপাশের ধ্বসে আরো ফুলে ফেঁপে এই নদী যখন নীচের উপত্যকায় লাফিয়ে পড়ে—তখন মনে হয় না, নদী তুমি জীবের মতো। প্রতি বছরই বন্যা আসে, ইতিহাস হয়ে আছে তিনটি সাল ১৮২৩, ১৮৫৫, ১৯৪৩।

৪৩ সাল ছিল যুদ্ধের সময়। ১৬ই জুলাই বর্ধমানের কাছে আমিরপুরে সামান্য বন্যায় বাঁদিকের পাড় একটু ভাঙল। বাঁধের ওপারেই ছিল মহাহাজা আর একটি নদী দেবীদহের শুকনো খাত। ২ লক্ষ কিউসেক জল ঝাঁপিয়ে পড়ল দেবাদহে। বাঁকা, বেহুলা, গাঙ্গুর চেষ্টা করেছিল বন্যা বাঁচাতে, পারে নি। তিনটি নদীরই বাহিনী ক্ষমতা বহুকাল আগেই শেষ। হঠাৎ যৌবনে অসহায়। শক্তিগড় থেকে কালনার মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল চলে গেল ৭ ফুট গভীর জলের তলায়। জুলাই থেকে অক্টোবর ট্রেন বন্ধ। ইংরেজের বার্মা অভিযান ছ'মাস দেরি হয়ে গেল। রেল কোম্পানীর ৫০ লক্ষ টাকা গেল ঘুরপথে ট্রেন চালাতে।

টেনেসি ভ্যালি অথরিটির বিশেষজ্ঞরা এলেন বন্ধনী পরিকল্পনা নিয়ে। দামোদর উপত্যকা আজ শান্ত। সমৃদ্ধির রোদ পোহাবে অসংখ্য মানুষ। দামোদর বাধা পড়েছে—তার কাছে চাই বন্যা নিবারণ, জল নিকাশ, জল সেচ, ম্যালেরিয়া নিবারণ. জলপথে চলাচল, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্প বিকাশ, শহর গঠন, আধুনিক জীবনযাত্রার পত্তন। পরিকল্পনার এত বছর পরেও, দামোদর উপত্যকার কোনো খবর কি পাইবে—

বৃথাই রে বোন গিয়েছিলাম
ঠিক করতে হালের কাঠি
বৃথাই আমি ছড়িয়েছিলাম বীজ
বৃষ্টি আজো এল নাকো
বৃষ্টিকে দে আসতে দে।

দামোদর আজ শুধু সেচের জল, কি জলপথ, কি বিদ্যুৎ দিচ্ছে না। যৌবনের অমিত তেজ ঝরিয়ে সে আজ নাব্য। দামোদর উপহার দিয়েছে একাধিক পর্যটন কেন্দ্র—তিলাইয়া, কোনার, বোকারো, মাইথন, পাঞ্চেট, আয়ার, বারমো, বনপাহাড়ি। শীতের নরম রোদে পিঠ রেখে, মাথায় পাতার টুপি চাপিয়ে বাংলোর বারান্দায় বসে তাকিয়ে থাকো বাঁধের দিকে। স্থির জলে আকাশ লুটিয়ে আছে। নীল গুলে যাচ্ছে জলে। লাল ঠোঁট টিয়ার ঝাঁক উড়ছে। পাহাড়ের পায়ে সবুজ আছে কুঁচকে। পাথরের দেয়াল ঘেরা জলাধারে অলস ভঙ্গিতে দোল খাও। ছিপ ফেলে দাও ধৈর্যের পরীক্ষায়।

যন্ত্রবিৎদের তৈরী বিস্ময় দেখার জন্যে আছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র—তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেট। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পাবে বোকারো, দুর্গাপুর, চন্দ্রপুরা। সবই ডি. ভি-সির দান। চন্দ্রপুরার মত এতবড় ষ্টিম টারবাইন জেনারেটার খুব কমই ছিল। সবচেয়ে বড় জেনারেটারের ক্ষমতা ছিল ৭৫ হাজার কিলোওয়াট। পঞ্চাশ শাল অবধি ৫০ হাজার কিলোওয়াট শক্তিই ছিল সর্বোচ্চ। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কিলোওয়াট একটি বড় লাফ।

কলকাতা বন্দর বাঁচাও। আজকে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় বন্দর আটসাট পলির বাঁধনে শ্বাসরুদ্ধ। জীবন যায় জীবিকা যায়। এতবড় কলকাতার সব আয়োজনই বুঝি সপ্তগ্রামের মত অতীতের স্মৃতি হয়ে যাবার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত। হলদিয়া একটি বিকল্প মাত্র। কলকাতার প্রাণভ্রমর ফরাক্কায় বন্দী। বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছেন, বন্দর বজায় রাখার জন্যে সারা বছর হুগলী নদীতে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার কিউসেক জলের প্রবাহ বজায় রাখতে হবে, তবে নদী মুখের সঞ্চিত

পলিস্তর সাগরে ধুয়ে যাবে। দেশী, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অভিমত ৪০ হাজার কিউসেকে নদীকে আমরা ৩৬ সালের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। ২৬ ফুট ড্র্যাফটের জাহাজ তখন বন্দরে ঢুকতে পারবে বছরের যে কোনো সময়ে। বানের উৎপাতও কমে যাবে। ফরাক্কার জল নিয়ে দু দেশের বিবাদ আর একটি ঐতিহাসিক বিবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই যুদ্ধের নায়ক সম্রাট রাজেন্দ্র চোল। সময় দশম শতাব্দির শেষার্ধ। পরকেশরী বর্মা রাজেন্দ্র ছিলেন শৈব। তাঞ্জোরের বিরাট রাজরাজেশ্বর মন্দির পিতা রাজারাজের অক্ষয়কীর্তি। পিতা-পুত্র দুজনে মিলে ভারতে এবং সাগরপারের বিজিত রাজ্যে বহু শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেইসব মন্দিরে পূজোর জন্যে জালা জালা গঙ্গাজলের প্রয়োজন। তাছাড়া বিজিত রাজ্য থেকে বৌদ্ধধর্মের আবিলতা ধুয়ে শুদ্ধ করার জন্যেও গঙ্গাজলের প্রয়োজন। কিন্তু গঙ্গা কোথায়। দক্ষিণ ভারত থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে গঙ্গার কলকল্লোল। ভগীরথ তপস্যাবলে গঙ্গা এনেছিলেন, সূর্যবংশীয় সম্রাট রাজেন্দ্র ঠিক করলেন বাহুবলে গঙ্গা আনবেন।

যেসব রাজ্য মাড়িয়ে গঙ্গায় পৌঁছোতে হবে, সেইসব রাজ্যের রাজারা, রাজেন্দ্রর জলবাহীদের আস্কারা দিতে রাজী নন। রাজেন্দ্রের সেনাপতি বিক্রম রণং দেহি বলে বেরিয়ে পড়লেন। চোলের শত্রু চালুক্য। চালুক্যরাজ ছোটো ছোটো রাজাদের মদত দিতে লাগলেন। প্রথম বাধা এল চন্দ্রবংশীয় রাজা ইন্দ্ররথের কাছ থেকে। বিক্রম তাঁকে টুসকি মেরে উড়িয়ে দিলেন। চোল সৈন্য দুর্গম ওড্রবিষয় ও মনোরম কোশলনাডু পার হয়ে বর্তমান মেদিনীপুর তৎকালের দণ্ডভুক্তি ভেদ করে গৌড় সীমান্তে ঢুকে গেলেন। দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল অসহায় তাঁর প্রতিরোধ চূর্ণ করে চোল সৈন্যরা এলেন দক্ষিণ রাঢ়ে। গঙ্গা এখন হাতের মুঠোয়। রণ শূর তখন রাঢ়ের রাজা। পরাজিত হলেন বঙ্গাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র। গৌড়েশ্বর মহীপাল এলেন সাহায্যে।

দাঁড়াতে পারলেন না। রণে ভঙ্গ দিলেন। উত্তর রাঢ়ও এল চোলের দখলে। রাঢ়ের ঐশ্বর্য, সুন্দরী নারী, পবিত্র গঙ্গাবারি সবই চোল সম্রাটের দখলে। গঙ্গা থেকে খাল কেটে তাঞ্জোরে প্রবাহিত করার কথা স্বয়ং বিশ্বকর্মাও ভাবতে পারেন না। পরিবর্তে দলে দলে গেল জলবাহীরা, কালীঘাট আর নবদ্বীপ থেকে ভারে ভারে জল নিয়ে গিয়ে তাঞ্জোর মহামন্দিরের শিবগঙ্গা পূর্ণ করল। কাবেরী নদীতে কিছু ঢেলে দিল গঙ্গাইকোণ্ডা চুলপুরমে চোলগঙ্গও পবিত্র করে নিল।

এই তো রাজার খেয়াল। আমাদের খেয়ালও কম যায় না। তবে তা পাগলামি নয়। ফরাক্কায় কত কোটি গেছে। দামোদরকে বাগে আনতে রাজঐশ্বর্য লেগেছে। এখন পরিকল্পনা গঙ্গার বদ্বীপ এলাকায়, হল্যাণ্ড তৈরি করতে হবে। এই স্বপ্ন স্বর্গত ডাঃ রায়ের। ১৬শোর কলকাতার চেহারাও তো ওই সুন্দরবনের মতই ছিল। কলকাতা যদি কলকাতা হতে পারে সুন্দরবন কেন নব কলকাতা হতে পারবে না। ডাচ ডেল্টা প্ল্যানের করিতকর্মা স্থপতি, কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং রিভার রিসার্চের বিজ্ঞানী, সকলে মিলে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ এবং পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছেন। সি এম পি ও করেছেন খরচের হিসেব। ১৮-৭৫ কোটি টাকা লাগবে প্রথম স্তরের কাজ শেষ করতে।

পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ সীমানায় অজস্র নদী নালার জট। সকলেরই শেষ পরিণতি সমুদ্র। জীবন দানের জন্যে উন্মুখ। হুগলী নামখানা, সপ্তমুখী, ওয়ালস, কারচারা, গোবাদিয়া, ঠক্‌বান, মাতলা এই ত্রিস্তর পরিকল্পনায় সমস্ত নদীই ধরা পড়বে বাধের আবেষ্টনীতে। গ্রেট মাস্টার প্ল্যানে হুগলীর মুখ থেকে মাতলা পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়াবে বাধের প্রাচীর। ঝটিকাক্ষুব্ধ সুন্দরবনে মানুষের আধিপত্য স্থাপিত হবে। এক লক্ষ ২৫ হাজার একর সমুদ্র উপকূলে গড়ে উঠবে শিল্প, কৃষি, শহর, অরণ্য, মৎস্যাধার, ভ্রমণকেন্দ্র। তৈরি হবে

১০ কোটি ২০ লক্ষ কিউবিক মিটারের সুমিষ্ট জলাধার। দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণা হবে অর্থনীতির জাপান, সমৃদ্ধির হল্যাণ্ড।

চার হাজার বর্গ কিলোমিটার সুন্দরবনের সম্পদ নদীরই দান। জঙ্গল থেকে আসছে—কাঠ, ১২,৮১,০০০ কিউবিক ফিট, জ্বালানী ৩,৭৭,৯০০০ কিউবিক ফিট, ৩০০০ মনের মতো চাকভাঙা মধু, বছরে। বছরে। মাছ আসছে বছরে ৩২০০ মেট্রিক টন। মৎস্য কেন্দ্র হলো—নামখানা, কাকদ্বীপ, হাসনাবাদ, ডায়মণ্ডহারবার, কালীনগর, রায়দিঘি, পোর্ট ক্যানিং। মৎস্য সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে ৩৪টি। ফ্রেজারগঞ্জে বসেছে সরকারী কেন্দ্র—তৈরি হচ্ছে শুঁটকি মাছ আর হাঙরের তেল।

নেদারল্যাণ্ড পরিকল্পনায় চতুর্থ বছরে ফল প্রত্যাশা করা যাবে। ষষ্ঠ বছরে বিশ হাজার একর জমি চাষে আসবে। সাত হাজার একর পাবে সেচের জল। সপ্তম বছরে ৮৫০০ একর জমি এবং অষ্টম বছরে ১৭০০ একর জমি দোফসলী হবে। মাছের চাষ বেড়ে যাবে ৫০ শতাংশ। মাতলার সৌন্দর্য দেখে মানুষ মাতাল হয়ে যাবে। সাগর নয় অথচ সাগরের স্বাদ, নোনা জলে? সুস্বাদু জল সুন্দরবনের নতুন রূপের এই সুন্দর প্রতিশ্রুতি।

গঙ্গাকে অনুসরণ করে আমরা দামোদরকে নিয়ে সাগরে এসে পড়েছি। পশ্চিমবাংলার উত্তরের হৈমমুকুটের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। অথচ ভূগোলের প্রাথমিক শিক্ষাই হলো স্পষ্ট দুটি ভাগে পশ্চিমবাংলার ভূপ্রকৃতিকে ফেলা যায়, গাঙ্গেয় উপত্যকা, হিমালয় সংলগ্ন ভূভাগ। এইভাবে একটা শ্লোগান দেখা যেতে পারে—নদী যদি দেখতে চান উত্তরবঙ্গে চলে যান। পাহাড়ের ব্যালকনি থেকে মুখ ঝুলিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন। চশমা সাবধান। বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট হেড গিয়ারস। ভার্টিগো থাকলে নিয়ারবাই গাছের সঙ্গে মাফলার দিয়ে নিজেকে বেঁধে রাখুন। এণ্ড ডাউন ফ্লোস দি তিস্তা। পর্বতরাজের দুধবরণ কন্যা। মেঘবরণ চুল মাইনাস।

উত্তর সিকিমের ২১ হাজার ফুট উঁচু এক হিমবাহ থেকে তিস্তা নামছে। সমগ্র সিকিমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে উঠেছে

দার্জিলিং-এ। সেখানে রংপু এসে তিস্তায় মিশেছে সেইখান থেকে শুরু করে, পশ্চিম দিক থেকে ছুটে আসা বড় রঙ্গিতের মিলনস্থান পর্যন্ত তিস্তা দার্জিলিং-এর সীমানা এঁকেছে। এরপর সিভক পর্যন্ত তিস্তা দার্জিলিং-এর। সিভক অতিক্রম করে তিস্তা চলে গেছে বাংলাদেশের রংপুরে। সেখানে ব্রহ্মপুত্র তাকে কোলে তুলে নিয়েছে।

তিস্তায় স্নানের চেষ্টা না করাই ভাল। এমনকি পায়ের পাতা ডোবাবার চেষ্টা থেকেও বিরত থাকুন। সাঁতার জানলেও নো হোপ। নৌকো অচল। দুঃসাহসী ভেলা ভাসাতে পারেন, তাও বর্ষায় নয়। ঘণ্টায় গতিবেগ ১৪ মাইল। এই চওড়া গিরি-নদী ছুটে আসছে অসংখ্য মগ্নচর আর প্রপাত সৃষ্টি করতে করতে। প্রবাহপথ গিরিসংকটে মাঝে মাঝে সংকীর্ণ হয়েছে, ফলে কখন যে হঠাৎ জল ফুলে ফেঁপে উঠবে নদীও জানে না।

শুকনোর সময় জলের রং সিন্ধু-সবুজ। সিকিমে যখন বরফ গলতে থাকে তিস্তার তখন যৌবন। বর্ষায় তার একটিই সংগীত—এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে! জলের রং তখন দুগ্ধ-ধবল। রঙ্গিতের সঙ্গে দেখা হবার পর তিস্তা ঢুকেছে গভীর গিরিসংকটে, তখন তার দুই তীরের ব্যবধান একশো গজেরও কম। সংকট ছেড়ে যখন সে সমতলে তখন তার ব্যাপ্তি বিশাল, দুশো থেকে তিনশো গজ।

কে যেন বলেছিলেন—আহা তিস্তা। দূরে গিরি খাতের মধ্যে দিয়ে ফিতের মতো এঁকে বেঁকে চলেছো। দু'ধারের খাড়া পাড় বেয়ে ঘন জঙ্গল বৃক্ষের ঐশ্বর্য নিয়ে ঘন কুয়াশার ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। মাঝে মাঝে প্রবাহের পাশেই সবুজ উপত্যকা। প্রজাপতি ভোমরা কত রংয়ের হতে পারে; ক্রন্তীয় পতঙ্গের এই কি স্বর্গ। ৫০ সালের পর থেকে তিস্তা আরো ভয়াবহ হয়েছে। ৭২ ঘণ্টার প্রচণ্ড বৃষ্টিতে তিস্তা সিকিমে একটি জলাধার ভেঙে ফেলে এখন অমিত বলশালী।

বড় রংগীত তিস্তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপনদী। উৎস সিকিমে। উত্তর সীমানা বরাবর জেলায় প্রবেশের সময় দক্ষিণ তীরে যুক্ত হয়েছে

রম্মাম। এরপর পূর্ব দিকে চলতে চলতে দার্জিলিং-এর দিক থেকে দুটি উপনদী পেয়েছে—ছোট রংগীত এবং রংনু। রম্মাম উঠেছে ফালুট পর্বতের তলা থেকে ছোটো রংগীত টাংলুর তলা থেকে আর রংপু সেঞ্চলের বুক চিরে হাজার হাজার ফুট নীচের উপত্যকায় নেমে গেছে। গর্জন শোনা যাবে। উপত্যকায় প্রান্ত থেকে প্রান্ত দেখা যাবে। নদী কিন্তু গভীর খাতে অদৃশ্য। সারসের মতো গলা বাড়িয়েও ওপর থেকে দেখার কোনো উপায় নেই।

বড় রংগীতের কোনো তুলনা নেই। রানীর মতো তার চালচলন। চলন তার পাথর আর বালির ওপর দিয়ে। দু'পাশে খাড়া পাহাড়, কুঞ্চিত মেঘপৃষ্ঠের মত জঙ্গলে ঢাকা। বড় রংগীত আর তিস্তার মিলনও আনফরগেটেবল। কি জিনিস, মাই গড। প্রগাঢ় সবুজ স্বচ্ছ রংগীত নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে তিস্তার দুগ্ধ ধবলে। প্রকৃতির সেরা ককটেল।

তিস্তার পূর্বদিকে আরো অনেক গিরিনদী নেচে নেচে ব্রহ্মপুত্রের দিকে চলে গেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেগবান এবং ভরপুর হলো জলঢাকা। সিকিমের ন্যাটং পর্যন্ত সমগ্র অববাহিকার বর্ষাবারির ঐশ্বর্য জলঢাকার বুকে। ন্যাটং থেকে এক সময় তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য পথ চালু ছিল। ১২ হাজার ফুট উঁচু থেকে নীচের উপত্যকার দিকে তাকান। ওই দেখুন রূপালী তলোয়ারের ফলার মতো সোজা পড়ে আছে বহু নীচে জলঢাকা। জলঢাকা আমাদের জলবিদ্যুৎ দিচ্ছে। তিনটি ভাঙনের নদীর নাম—লিশ, গিশ আর চেল। নদীর বেড ক্রমশই ঠেলে উঠছে। বাস্তুকারদের সঙ্গে ব্রিজ উঁচু করার প্রতিযোগিতা চলেছে।

তিস্তার পশ্চিমের নদী—মহানদী, বালালন, মেচি। সবাই মুক্ত হয়েছে গঙ্গায়। মহানদী উঠেছে কার্সিয়াঙের পূবে মহালদিরাম থেকে। প্রচুর বর্ষার জলে হৃষ্টপুষ্ট। শিলিগুড়ি অবধি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে হঠাৎ দক্ষিণ পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। মহানদী তখন ফাঁসিদেয়া পর্যন্ত তরাই আর জলপাইগুড়ির সীমানাসূচক।

নেপাল আর দার্জিলিংয়ের মাঝে বইছে আর একটি মজার নদী

মেচি। মেচির উপনদীরা সব সীমান্তের ওপারে। বছরের শুকনো সময়ে মেচি গিরিসঙ্কটে মুমূর্ষ। যেই বর্ষা এলো, লাফিয়ে পড়ল সমতলে তাল ঠুকে, পাথরের গোলাগুলি নিয়ে, সংগ্রাম তার জমির সঙ্গে অরণ্যের সঙ্গে। মেচি হলো পাথরের প্রবাহ।

নদী নিয়ে মানুষ বহুকাল নাকাল হয়েছে। কাজের চেয়ে তার অকাজ বেশী। ভাগীরথীর কথাই ধরা যাক। মুর্শিদাবাদে এতকাল তার কি খেলা ছিল! উত্তর থেকে দক্ষিণে জেলাকে চিরে দু খণ্ড করে প্রবাহিত হয়েছে। দু'দিকে প্রকৃতির চেহারা দু'রকম। পশ্চিমের ভূখণ্ড হল রাঢ়, পূবের বগরি। একটা এরিয়েল ভিউ নিলে মনে হবে রাঢ়ের জমি যেন ঢেউ খেলানো নদী। নদীর বুকে কোনোকালে উঠেছিল ঢেউ, অদৃশ্য শক্তি চিরকালের মতো সেই তরঙ্গকে স্তব্ধ করে জমির বুকে ধরে রেখেছে। আবহাওয়া উগ্র, একটা শুকনো ভাব। বগরি হলো নিচু অঞ্চল—নদীবিধৌত, জল সিঞ্চিত। উপচীয়মান ভাগীরথীর জলে বর্ষায় থৈ-থৈ। জেলার দক্ষিণ পশ্চিমে মোর আর দ্বারকা নদীর সংযোগ স্থলে তরুশূন্য হিজল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে প্রেত-লোকের কথা মনে পড়বে। পিয়া মিলনকে আশ। দক্ষিণ পূর্বে সেই কালান্তর বিল। চাপ চাপ থক থকে কালো কাদার আকণ্ঠ সমুদ্র—আর এক হিংলাজ। রোজ রাতে এখানেই বোধহয় বেরোয় হাউণ্ডস অফ বাস্কারভিল। জেলার ৫০ বর্গমাইল এই বিল গ্রাস করে নদীয়াতেও ঢুকে পড়েছে।

বন্যার নদী জেলায় অনেক। বাঁশোলি পাগলা, চোরা ডেকরা, দ্বারকা, হাঙ্গর ডোবা, ভৈরব, ব্রাহ্মণী, মোর, কইয়া। সঙ্গদোষে ভাগীরথীও দুর্দান্ত। পদ্মা থেকে বর্ষার শক্তি ধার করে চারিদিকের পাড় ভেঙ্গে এক সাংঘাতিক খেলায় মেতে আছে। হঠাৎ সাতসকালে দেখা গেল চর জেগেছে। দেখতে দেখতে ঘাস গজাল, হাতির চেয়ে উঁচু ঝাউগাছের জঙ্গলে ছেয়ে গেল চারদিক। জঙ্গল সাফ করে মানুষের চাষপাট বসল। চরগ্রামে রাতের বেলা হ্যারিকেনের সারি, খোলের

আওয়াজ। ধানের শিষে হাওয়ার দোলা। আবার আর এক সকালে সব ভোজবাজী। কোথায় কি? কোথায় তীর? কোথায় চর! চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি লক্ষ লক্ষ হাতে। ভাগীরথী আধ ঘণ্টায় এক একর জমি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এমন নজিরও আছে।

নবদ্বীপ নদীরই দান।

'নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি?
যহি অবতীর্ণ হৈল্যা চৈতন্য গোসাঞি।'

কে সেই সাধক যিনি ত্রিনদী-বিধোত এই ত্রিভুজ আকৃতি ভূখণ্ডে গভীর রাতে নয়টি প্রদীপ জ্বেলে সাধনা করে সিদ্ধ হয়ে নিজেকে ইতিহাসের উদাসীনতায় হারিয়ে যেতে দিয়ে তাঁর নয়টি দ্বীপের সাধনাকে জেলার নামে অক্ষয় করে রেখে গেছেন? নবদ্বীপ এক সময় নদীদের অভয় অঙ্গন ছিল। জলঙ্গি, ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী, ইছামতী নিজেদের খেয়াল খুশীমত এঁকে-বেঁকে একূল ভেঙ্গে ওকূল ভেঙ্গে বেশ ছিল। দূর-দূরান্তরের মানুষ হঠাৎ সঙ্গম স্নানের পুণ্যজনে ছুটে এল, বসল জনপদ। আটশো বছর আগে গৌড় থেকে রাজ্যপাট গুটিয়ে ভাগীরথীর তীরে পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় নবদ্বীপে এলেন লক্ষ্মণ সেন। পিতা বল্লাল সেনও চিনতেন এই জেলাকে।

মাটিতে কান পাতলে মহম্মদ বখতিয়ারের তুরকী ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর শোনা যাবে না। প্রতাপাদিত্য ইতিহাসের পাতায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কাহিনীমাত্র। গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা বটতলার প্রকাশনে। শ্রীমন্ত সওদাগরের ময়ূরপঙ্খী বীরনগরের ঘাটে বাঁধা নেই। সেই ঐতিহাসিক ঝড়ের রাতে মা ওলাইচণ্ডী সওদাগরকে পথ দেখিয়ে বীরনগরে নোঙর করিয়েছিলেন। মা'র স্থান পাকা হয়েছে বীরনগরে। ভাগীরথী বহুকাল সরে গেছে নিজের খেয়ালে। ওলাইচণ্ডীর মেলায় ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে যখন একটু জলের কথা মনে পড়বে তখন হয়তো অনেক দিন আগের জলোচ্ছ্বাসের শব্দের সঙ্গে কাঠের পাটাতনে

নোঙর তোলার শব্দ শোনা যাবে। ফুটিফাটা মাঠে দাঁড়িয়ে কানে ভেসে আসবে নাবিকের গান—হেই হো।

নবদ্বীপ থেকে প্রবাহিত হয়েছে আর এক নদী বৈষ্ণব ধর্ম। রসিক ভাঁড় অমর রসের খাবারে। ঘূর্ণির মৃৎশিল্পে ইংরেজ প্রভাব। নবদ্বীপ একটি কালচারাল মিক্‌স। উঁচু জাতের ব্লেণ্ড। অনেক বছরের প্রবাহে সিজনড। আমাদের সাহিত্যের বাংলা ভাষার প্রচলিত রূপ তৈরী হলো নদীয়ার মাটিতে। কালচার উঠল এই জমি থেকে। শিখলাম—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্‌
নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুলনক্ষত্রম্‌।

এবার নদী তুমি আমাদের একবার বাউলের দেশে নিয়ে চল। নিয়ে চল সেই নিকেতন শান্তিনিকেতনে। রাতের অন্ধকারেই যাই গরুর গাড়ি চলছে বিলম্বিত একতালে। তলায় দুলছে লণ্ঠন। একটি তারে একটি সুর—

গুরু আমায় মুক্তি ধনের দেখাও দিশা।
কম্বল মোর সম্বল হোক দিবানিশা।
সম্পদ হোক জপের মালা
নাম-মণির দীপ্তিজ্বলা।
তুম্বীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয় তৃষা।

'আমি যখন তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব কোনো একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংস্টোন। এটা যেন একটা দূরবীণের উল্টোদিকের দেশ। নদী পাহাড়গুলো যেমন ছোটো মাঝে মাঝে ইতস্তত বুনো জাম বুনো খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটেখাটো। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় ছেড়ে এখানে এসে বসলেন। সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার

সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তর সীমায় সূর্যোদয় হইত।' সে উপাসনা আজও চলেছে। চলেছে ময়ুরাক্ষী এঁকে বেঁকে। দুই তীরে মাদলের শব্দ শুনতে শুনতে সাঁওতাল পরগণা থেকে এই নদী এসেছে প্রেমিকের কলগুঞ্জন নিয়ে। খোয়াইয়ের পাশ দিয়ে তার ব্রীড়িত চলন। আমি চলেছি ভাগীরথীতে। সাঁওতালের গান যদি কানে আসে, সে গানে শুধুই প্রেম—

বাড়ীতে তুমি
আমি নদীর ধারে
কি করে আমি তোমায় জানব, প্রেমিক আমার
নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থেকো
বাঁশী বাজিও তোমার
শুনবো আমি আসব আমি
আমার প্রেমিক।
যদি কানে আসে—
আত্মতত্ত্বায় স্বাহা
বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা
শিবতত্ত্বায় স্বাহা।

বুঝতে হবে তন্ত্রের পীঠস্থান বীরভূম। এখানেই সেই মহাপীঠ। তারাপীঠ। এখানেই সেই বক্রেশ্বর। বটল্ড ওয়াটার। বাতের যম। ময়ুরাক্ষী সেচ পরিকল্পনা বীরভূমের কৃষির স্বপ্নকে সফল করেছে। মশানজোড়ের জলবিদ্যুৎ জেলায় আলো এনেছে শিল্প আসতে শুরু করেছে। পাঁচ-পাঁচটি সতীপীঠের শক্তি নিয়ে এই জেলা আকাশের তলায় মানুষের মেলা বসিয়েছে। আধুনিক জীবনের তলা থেকে সুর উঠছে—

তারে খুঁজলে মিলতে পারে
বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা
দেখ আপন ঘরে।

এইবার একটু পা ছড়িয়ে বসব বাঁকুড়ায় কংসাবতী বিশ্রাম ভবনে। আকাশ যখন উষায় লাল তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবো জলাধারের দিকে। কোনো শব্দ নেই, আকাশের সীমানায় টিপি টিপি পাহাড়। মাঝে মাঝে মাছরাঙা ইলেকট্রিক তারের ওৎ পাতা আসন থেকে ছোঁ মেরে জলের কিনারা থেকে মাছ তুলে নিচ্ছে। কংসাবতীর জলাধারে বড় শান্তি। যেন সাধনার জায়গা। হায় নদী। মৎস্যাশী বাঙালীর মাছরাঙা মন বড় মাছ মাছ করছে মা গো। কোথায় গেল তারা। এই যে মৎস্যপুরাণ—

মাগুর, সিঙ্গি, বোয়াল, বাচা
পাফতা, কাজুলী, পাঙাশ
সিলাদ আড়, ট্যাংরা
রুই, কালবোস, গোনি, বাঙী
মৃগেল, কাতলা, মহাশোল
ভেটকি, তপসে, ইলিশ
শোল, শাল, পাঁকাল, চ্যাং
ফলুই, ফাঁসা, পাঁকাল।

হরেক রকম চিংড়ি। জেলায় জেলায় এত জল, এত ড্যাম এত নদী। মাছ কোথায় ভাই! শেরউইল সাহেব লিখছেন ১৮৫০ সালে কলকাতার দু মাইল উত্তর পূর্বে ১৬ থেকে ২৪ ফুট লম্বা ২০টা তিমি মাছ মারা হয়েছিল। তিনি লিখছেন, সুন্দরবন বড় ফাসক্লাশ জায়গা মশাই, ঘন জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল গুটিয়ে আছে, এদিকে জলে থিকথিক করছে, কামট, কোমোট, হাঙর-কুমির, গোটা কতক গণ্ডার হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তেমনি মাছ—নোলায় জল এসে যায়, তিমিও আছে। তখন তিমি উঠতো কলকাতায়, আর এখন একটা ইলিশ উঠলে পার্ক স্ট্রীটে নিলাম ডাকতে হয়। কালস্য কুটিলা গতি।

কংসাবতীর মাছরাঙা দেখে বিভোর হয়ে লাভ কি। সালি, বোদাই দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, গন্ধেশ্বরী—কেউ কিছুই দেবে না। সেচের জল

দিক, তাহলেই যথেষ্ট। দামোদর ১৬২৩ গজের প্রস্থ নিয়ে দেখতে চুল বাঁধার রিবনের মতো। জল বইছে। কংসাবতী মেদিনীপুরে গিয়ে জেলার তলার দিকে পেয়েছে হলদীকে, তারপর দুজনে মিলে পড়েছে হুগলীতে। আমাদের অর্থনীতির নতুন ফ্রন্ট হলদিয়া। কলকাতার নিচের দিকে প্রায় ৫৬ জল-মাইল দূরে বন্দর হলদিয়া যেখানে ৪০ ফুটের মতো ড্রাফ্‌ট পাওয়া যাবে। বড় বড় জাহাজ ভিড়বে। শিল্পের নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠবে। বিশাল তর্জনীর মতো তেলের জেটি মধ্য জলে উচিয়ে আছে। আসছে আরো আসছে। আপাতত এই শীতের বেলায় দক্ষিণ ২৪-পরগণার নুরপুরের জেটিতে বসে দেখি সেই মিলিয়ান ডলার দৃশ্য—চোখের সামনে সোজা রূপনারায়ণ এসে পড়েছে হুগলীতে আর একপাশ থেকে এসে পড়েছে হলদী। সেই ত্রিবেণী সঙ্গমের ডানদিকে হাওড়ার তটরেখা, সামনে বামে মেদিনীপুর। রূপনারায়ণের নতুন ব্রিজের ধারে দেনানের ডাকবাংলোয় একদিন পূর্ণিমার রাতে অ্যাপয়েমেন্ট রইল। এই স্পটটার ভেল্যু অবশ্যই ফাইভ মিলিয়ান ডলার। মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ধনুক হয়ে আছে সুবর্ণ রেখা। ঘাটশিলায় দেখেছি এখানে দেখলুম, আবার ওড়িশায় দেখবো। সব নদীই বাঁধা পড়েছে রাজ ঐশ্বর্যের বিনিময়ে। কিছু নদী এখনো বেচালে চলছে। হুগলীর মুণ্ডেশ্বরী, কুন্তি, কানা নদী, সরস্বতী, কানা দামোদর, কানা দ্বারকেশ্বর, বেরিয়া, মাদাবিয়া কৌশিকী, বিহুলা সব কটাই হলো পোটেন্ট সোর্স অফ ফ্লাড আদার-ওয়াইজ ইমপোটেন্ট। আমাদের তিন হাজার একশো সত্তর মাইল জলপথ পণ্য চলাচলের আর একটি সহজ উপায়। নদী তার নিজস্ব ভাবালুতায় মন থেকে মনে সহজ সেতুবন্ধন গড়ে তোলে। রেলপথ স্থল পথ বড় কঠিন, বড় বিজাতীয়। এই রাজ্যে বছরে ২০২০০০ টন পণ্য নদীপথে চলাচল করে থাকে। কিন্তু বার্ধক্যের নদীতে এখন পলির ছানি ক্রমশই পুরু হচ্ছে।

শিল্প, কৃষি, খরা, বৃষ্টি প্রাচুর্য রিক্ততা বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস অবিশ্বাসের স্তর বেয়ে নদী চলেছে সাগরে। মানব জীবনের সমান্ত-

রাল প্রবাহ চলেছে কোন সাগরে! নদী দর্শন, জীবন দর্শন প্রায় এক।

ভেসে যাওয়া কত কি যে ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভক্ষতি কান্না হাসি
এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া
সেই প্রবাহের পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া

... ...

রাখিতে চাহিনা কিছু, আঁকড়িয়া চাহিনা বহিতে
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে।

নদীই বৃষ্টি, বৃষ্টিই নদী। অনন্ত লীলা চক্রাকার। মেঘ, বৃষ্টি, হিমবাহ প্রবাহ জগৎ নিয়মের সুচতুর কৌশল। দি রিভার ফ্লোওড অন টুয়ার্ডস ইটস গোল। অল দি ওয়েভস এণ্ড ওয়াটার হেস্‌টেন্‌ড সাফারিং টোয়ার্ডস গোলস, মেনি গোলস। যেমন চলেছি আমরা শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পারে। আমরা সর্বত্র, আমরা উৎসে, আমরা প্রবাহে, আমরা মিলনে, আমরা বিচ্ছেদে। কেবল মনে রাখি চৈনিক দার্শনিক লাও সজুর কথা।

নাথিং ইন দি ওয়ার্লড ইজ মোর সাপল এণ্ড সফট দ্যান ওয়াটার বাট ইভন দি মোস্ট হার্ড এণ্ড ষ্টিফ ক্যান নট ওভারকাম ইট।

৬

তুমি কালজয়ী মহামানব। তোমার সুমহান সৃষ্টির মাঝে তুমি চিরভাস্বর। ষোড়শ শতকের অন্ধকার দিকচক্রবালে তুমি ছিলে উষার অরুণাভাস। এভন নদীর তীরে সেদিন যে সূর্য উদিত হয়েছিল দীর্ঘ চার শতাব্দী পরে আজও তা মধ্যগগনের দীপ্তিতে দেদীপ্যমান। তোমার প্রশস্তি রচনা করে যুগের কবিরা ধন্য হয়েছেন। সাহিত্যিকরা সাহিত্যে করেছেন তোমার জয়গান। জীবনীকার তোমার জীবনের

রহস্য আবিষ্কারে আজও তৎপর। রাতের পর রাত বিস্মিত প্রেক্ষাগৃহের পাদপ্রদীপের সামনে খ্যাতিমান অভিনেতা তোমার অমর চরিত্রে প্রাণ-ঢালা অভিনয় করে আজও অমরত্বের সন্ধান খোঁজেন। শিল্পী তাঁর তুলি ও রঙের যাদুতে তোমার সুচারু চিত্রকল্পনার সার্থক রূপায়ণে আজও তন্ময়। সমস্ত যুগের কণ্ঠে সেই একই দাবী :

He was not of an age but for all time
He was a man take him for all in all
I shall not look upon, his like again.

শেক্সপীয়র এমনই এক প্রতিভা, যাঁর গোমুখীনিঃসৃত সৃষ্টি-তরঙ্গ সাহিত্য এবং শিল্পের উষর অববাহিকায় প্রাণের সাড়া তুলে শতাব্দী-পারের দূর লক্ষ্যে ধাবিত হয়েছে। কান পাতলে আজও আমরা সেদিনের কোলাহল শুনতে পাই। আমাদের প্রসারিত দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হয় সবুজের বিস্ময়। যে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ সাহিত্য ও শিল্পের প্রতিটি দীপশিখায় অগ্নিসংযোগ করে সহস্র প্রদীপের সমারোহ এনেছিল, সেই প্রতিভাকে প্রত্যক্ষ করে কবি বিস্ময়ে গেয়েছেন :

Others abide our Question—Thou art free !
We ask and ask—Thou smilest and art still.
Out-topping knowledge ! For the loftiest hill.
That to the stars uncrowns his majesty.
Planting his steadfast footsteps in the sea.
Making the heaven of heavens his dwelling
Place.

শেক্সপীয়র তাঁর সমসাময়িক কালের উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার পূর্ণাঙ্গ বিচার হয়ত সম্ভবপর হবে না। প্রতিভাকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন—সে যুগের তা ছিল না। এক অপ্রস্তুত জাতির সামনে তিনি তাঁর নৈবেদ্য হাজির

করেছিলেন, যার বৈচিত্র্যে দিশাহারা হয়ে সে যুগের এক নাট্যকার হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন :

"an upstart crow....in his own conceit the only Shakescene in a country".

কিন্তু দীর্ঘ ছুটি শতাব্দীর পারে এসে এক রসবেত্তা প্রস্তুত জাতি যখন তাকিয়ে দেখলেন—তাঁব সৃষ্টির রাজ্য থেকে জীবনের মিছিল বেরিয়ে আসছে—যে মিছিলে রাজা, প্রজা, পাগল, সন্ত, ভাঁড়, শয়তান, প্রেমিক, প্রবঞ্চক, জালিয়াত, দানী, কৃপণ, এক কথায় সৃষ্টির পূর্ণ সমারোহ—তখন তাঁরা শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন হ্যামলেটের মতই চীৎকার করে উঠলেন—"হোয়াট এ পিস অফ ওয়ার্ক ইজ ম্যান।" স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার ছুটি রসিক চোখে তিনি জগৎকে দেখেছিলেন। পক্ষপাতশূন্য সে দৃষ্টির সামনে পাপ-পুণ্যের বিচার ছিল না—ফলে তাঁর সৃষ্টির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছিল সমগ্র জগৎ—তার রূপ, রস, গন্ধ বর্ণের সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে।

সাহিত্যিকরা যে পূজার আয়োজন করলেন, শিল্পীরা কেন সেখানে অপাঙক্তেয় থাকবেন। স্রষ্টা শেক্সপীয়র তো শুধু জীবন্ত চরিত্রই সৃষ্টি করেন নি, তিনি অপূর্ব চিত্রলোকের অনন্ত ঐশ্বর্যও রেখে গেছেন উত্তরকালের শিল্পীদের জন্যে। তাঁর সমসাময়িক শিল্পীগোষ্ঠীতে মার্কাস ঘেরায়েটস্, কর্ণেলিয়াস, ও লুকাস ছ হীরের মতো শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত চিত্রকর থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সে ঐশ্বর্যের দিকে পিছনফিরেই ছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতক তাঁদের অন্ধ পূর্বপুরুষদের উদসীনতার প্রায়শ্চিত্তে এগিয়ে এলেন। তাঁরা দাবী করলেন—শেক্সপীয়র শুধু নাট্যকার ছিলেন না—তিনি ছিলেন শক্তিমান শিল্পী। তুলি এবং রঙের আঙ্গিকে হয়ত তিনি কিছু নিদর্শন রাখেননি, কিন্তু—"হিজ ওন পিকটোরিয়েল ইম্যাজিনেশন বিইং সো ইনডেপেনডেন্ট গ্রেট এণ্ড ওয়ানডারফুল ছাট হি কুড সাজেস্ট এ পিকচার উইথ এ ফিউ ম্যাজিক ওয়ার্ডস।"

তাঁদের এ দাবীর পশ্চাতে যুক্তির অভাব নেই। মার্চেণ্ট অফ

ভিনিসের শেষ অঙ্কে শেক্সপীয়র চন্দ্রালোকিত রাত্রির যে স্বপ্নময় দৃশ্য এঁকেছেন, রঙ ও তুলির আঙ্গিকে সে দৃশ্যকে রূপায়িত করার ক্ষমতা খুব কম শিল্পীরই আছে। পোর্শিয়ার সুরম্য উদ্যানে নির্জন, নিঝুম রাতে দুই প্রেমিক প্রেমিকা ঘনিষ্ঠ হয়ে চন্দ্রস্নান করছেন। একজন লোরেঞ্জো, অন্যজন জেসিকা। লোরেঞ্জোর মনের কল্পনার বন্ধ দুয়ার খুলে গেছে—তিনি বলছেন :

The moon shines bright!
In such a night as this

... ...

Treilus methinks mounted the Trojan walls
And sighed his soul toward the Grecian tents
Where Cressid lay that night

....

In such a night
Stood Dido with a willow in her hand
Upon the wild sea-Banks and waved her love
To come again to Carthage.

শেক্সপীয়র এই নিস্তব্ধ চন্দ্রোদ্ভাসিত রাত্রির প্রেক্ষাপটে বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসা প্রেমিক-প্রেমিকাদের জীবনের ঘটনাকে প্রতিফলিত করেছেন। এ রাত শুধু তাঁদেরই জন্য নির্দিষ্ট। সাধারণ মানুষের কাছে হয়ত এর কোন আবেদন নেই, কিন্তু কবির কল্পনায় এ রাত দীর্ঘশ্বাসে ভরা। সে শিল্পী কোথায়—যিনি এই রাতের বেদনাকে তুলি ও রঙে রূপ দিতে পারেন। অষ্টাদশ শতকের এক দুঃসাহসী শিল্পী চেষ্টা করেছিলেন এই দৃশ্যটিকে রূপায়িত করতে। সে শিল্পীর নাম স্যামুয়েল শেলী। তাঁর সেই ছবি কতদূর সার্থক হয়েছিল তা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

১৭৮৭ সালের নভেম্বর মাস। হ্যাম্পস্টেডের এক সুসজ্জিত ঘরে খানার টেব্‌ল পাতা হয়েছে। বন্ধু ও সহকর্মীদের নিয়ে আহারে

বসেছেন যোশিয়া বয়ডেল, অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের এক অতি সুপরিচিত ও স্বনামধন্য ব্যক্তি। একাধারে শিল্পী ও খোদাইকার। অল্ডারম্যান জন বয়ডেলের ভাইপো। আহারের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা চলছিল। বিষয়বস্তু সমসাময়িক ইংলণ্ডের চিত্রকলা। বয়ডেলের অভিযোগ—ইংলণ্ডের শিল্পীরা শুধু প্রতিকৃতিই এঁকে গেলেন, চিত্রকলার অন্যান্য বিভাগে তাঁরা কোন অবদানই রাখতে পারলেন না। ইউরোপীয় কলারসিকদের কাছে তাঁদের এই দুর্বলতা সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হতে চলেছে। হঠাৎ বয়ডেল এক প্রস্তাব করলেন। নভেম্বরের সেই দ্বিপ্রহরে খানা টেব্‌লে তিনি যে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, এবং তাঁর ব্যবসার অংশীদারগণ যে প্রস্তাব সেদিন নির্দ্বিধায় সমর্থন করলেন ইতিহাসে সেই মুহূর্তটি বয়ডেল শেক্সপীয়র গেলারির জন্মলগ্ন বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। শেক্সপীয়রের পূজারী যোশিয়া বয়ডেল নাট্যকারের অমর সৃষ্টির ঐশ্বর্যে, অজস্র উচাঙ্গের চিত্রসৃষ্টির উপাদানের সন্ধান পেয়েছিলেন। ইংলণ্ডের তদানিন্তন প্রায় সমস্ত ছোট বড় শিল্পীকেই তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন শেক্সপীয়রের রচনা থেকে দৃশ্যের পর দৃশ্য। শিল্পীরা মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁদের হাতে ছিল শক্তিশালী তুলি ও রঙের ঐশ্বর্য ; কিন্তু তাঁদের কল্পনা ছিল মুহ্যমান। শেক্সপীয়রের নাটকে তাঁরা খনির সন্ধান পেলেন। সমগ্র ইংলণ্ডের ষ্টুডিওতে ষ্টুডিওতে শুরু হল শিল্পীদের সাধনা। ১৭৮৯ সালের মধ্যেই বহু ছবি আঁকা হয়ে গেল। বয়ডেল পলমলের কাছে এক চিত্র সংরক্ষণশালা তৈরি করালেন—সেই সমস্ত ছবির প্রদর্শনীর জন্য। এই বিরাট চিত্রযজ্ঞে বয়ডেল মোট তিন লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। তাঁর শিল্পী গোষ্ঠীতে স্যার যোশুয়া রেনল্ড, রম্‌নি, ওপিল্ট, স্মির্কে, নর্থকোট, ফুসেলি, হ্যামিলটন, টেসহাম ও ওয়েস্টাল প্রমুখ যশস্বী শিল্পীরা ছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে শিল্পী জর্জ রম্‌নি ছিলেন এক উজ্জল জ্যোতিষ্ক। তাঁর চিত্রকলার আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য

করেছেন :—"দি থার্ড গ্রেট ইংলিশ পোর্টেট পেন্টার অফ দি এইটিন্থ সেনচুরি ওয়াজ জর্জ রম্‌নি বয়্‌ডেল শেক্সপীয়র গেলারিতে রম্‌নির যে অনবদ্য ছবিটি স্থান পেয়েছে—তা এককথায় অনন্যসাধারণ এবং সম্পূর্ণ মৌলিক। সেই বিরাট প্রতিভাকে তিনি যে চোখে দেখেছিলেন, ছবিখানি তারই সার্থক কাব্যিক রূপায়ণ। এই ছবির মাধ্যমে তিনি কবিকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন তা একমাত্র রম্‌নির মত স্বাধীনচেতা শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। ছবিখানির তিনি নাম রেখেছিলেন—'শেক্সপীয়র নার্স'ড বাই ট্রাজেডি এণ্ড কমেডি'। প্রকৃতির পটভূমিকায় একটি ছোট উলঙ্গ শিশুকে ঘিরে দুই সুন্দরী রমণীর লীলা ছবিটির বিষয়বস্তু। এই দুই নারীর একজন হলেন ট্রাজেডি, অন্যজন কমেডি, শিশুটি স্বয়ং শেক্সপীয়র। শিশু একটি ফ্লুট বাজাবার চেষ্টা করছে এবং এই দুই নারী তাকে বাজাতে শেখাচ্ছেন। শেক্সপীয়র যেন শৈশব থেকেই ট্রাজেডি এবা কমেডির দ্বারা লালিত পালিত। তাঁর বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটকের অতুলনীয় অবদান রম্‌নির এই কল্পনাকেই সমর্থন করে। শেক্সপীয়র সহজাত প্রতিভা নিয়েই এসেছিলেন, তা না হলে তাঁর সৃষ্টির আবেদন যুগ থেকে যুগংন্তরে প্রসারিত হত কিনা সন্দেহ। মিলটন যেন এই কথাই লিখেছিলেন :—

"আওয়ার সুইটেস্ট শেক্সপীয়র,
ফ্যান্‌সিজ চাইল্ড
ছাট ওয়ার্বলস হিজ নেটিভ
উড-নোটস ওয়াইল্ড।"

গ্রে তাঁর প্রগ্রেস অফ পোয়েসিতে এই কথাই সমর্থন করেছেন—নেচারস্ ডার্লিং। আর্নল্ড বলেছেন :—সেলফ-স্কুলড্, সেলফ-স্ক্যান্‌ড, সেলফ-অনারড, সেলফ-সিকিওর শেক্সপীয়রের জীবন ও প্রতিভার এই মৌলিক সত্যটিকে রূপায়িত করে রম্‌নি তাঁর গুনগ্রাহীদের যে ছবিখানি উপহার দিলেন তা শেক্সপীয়র সমালোচনার মূল কথা। এমন চিত্রকলা সমালোচনা—সমালোচনার ইতিহাসে প্রকৃতই বিরল।

১৬০২ সালে শেক্সপীয়রের দি মেরি ওয়াইভ্‌স অফ উইণ্ডসর

প্রকাশিত হয়। "এ মোস্ট প্লেজান্ট এণ্ড একসেলেন্ট কনসিটেড কমেডি অফ স্যার জন ফলস্টাফ এণ্ড দি মেরি ওয়াইভস অফ উইণ্ডসর" এই চটুল হাস্যরসাত্মক নাটকটির প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের একটি নাটকীয় ঘটনা অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের একাধিক শিল্পীকে চিত্ররচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। মিস এ্যাজ পেজ স্লেণ্ডারকে বলছেন—অনুগ্রহ করে ভেতরে চলুন। খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। অন্যান্য সকলেই আহারে বসেছেন—আপনি কেন বাইরে দাঁড়িয়ে। গ্রাম্য স্লেণ্ডার, দ্বিধাগ্রস্ত, হতচকিত। সে সলজ্জভাবে বলছে—না, না, আমার ক্ষিদে নেই। আপনি বরং আমার ভাই ব্যালোকে দেখুন—তিনি একজন জাস্টিস অফ পীস ইত্যাদি। তখন এ্যান পেজ আবার বলছেন—আপনাকে ভেতরে নিয়ে যেতে বলেছেন—আপনি না গেলে ওঁরা খেতে বসবেন। স্লেণ্ডার বলছে—সত্যি বলছি, আমি খাব না—ইতাদি।

এ্যান পেজ : উইল ইট প্লিজ ইওর ওয়ারশিপ
টু কাম ইন স্যার ?
স্লেণ্ডার : নো, আই থ্যাঙ্ক ইউ,
ফোর সুদ হার্টিলি :
আই এম ভেরি ওয়েল।

এক সুন্দরী নারীকে কেন্দ্র করে, এক গ্রাম্য পুরুষের সলজ্জ বিভ্রান্তির মাঝে শেক্সপীয়র যে নাট্যরসের উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন, শিল্পীরা তারই মাঝে পেলেন এক সুন্দর চিত্রের কল্পনা। প্রথম যে শিল্পী চিত্রে এই দৃশ্যটিকে রূপায়িত করলেন—তাঁর নাম রবার্ট স্মির্কে। তিনি শেক্সপীয়রের ভাবটি ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়। নাট্যকারের মেজাজের সঙ্গে নিজের মেজাজ এক করতে পেরেছিলেন বলেই, সমালোচকবর্গ বয়ডেল শিল্পীগোষ্ঠীতে স্মির্কের জন্য স্বতন্ত্র স্থান চিহ্নিত করেছেন।

স্মির্কেই প্রথম শিল্পী যিনি পরবর্তীকালের অন্যান্য শিল্পীদের দৃষ্টি শেক্সপীয়রের নাটকের এই অপূর্ব মুহূর্তটির দিকে আকৃষ্ট করেন।

উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে আর একজন প্রতিভাবান শিল্পী এই মুহূর্তটিকে চিত্রে রূপায়িত করেছিলেন। শিল্পীর নাম রিচার্ড পার্কস বনিংটন, ল্যাণ্ডস্কেপ ও সামুদ্রিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে চিত্রসৃষ্টিতে তাঁর সমকক্ষ শিল্পী তদানীন্তন ইংলণ্ডে কেউ ছিলেন না। প্রতিকৃতি অঙ্কনেও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। চিত্রজগতে রোমান্টিক ভাবধারার প্রবর্তনায় তিনি ছিলেন পথিকৃত বনিংটন স্বভাবতই শেক্সপীয়রের নাটকের এই দৃশ্যটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য স্মির্কের মত বিষয়বস্তু নাটকীয় কৌতুকরসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। আলোছায়া ও রঙের খেলায় তাঁর ছবিখানি স্বতন্ত্র হয়ে আছে। বনিংটন ছিলেন রোমান্টিক সুতরাং চিত্রখানির দৃশ্যরচনায় ও পঞ্চদশ শতকের সাজ-সজ্জার সার্থক রূপায়ণে তিনি নাট্যকারের সমসাময়িক কালকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

বনিংটনের পর একজন স্কচ চিত্রকর টমাস ডানকান এই সব বিষয়বস্তু অবলম্বনে একখানি ছবি এঁকেছিলেন। শিল্পীর জীবনে সেই ছবিখানিই শ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। স্কটল্যাণ্ডের ন্যাশানাল গেলারিতে ছবিখানি বিশিষ্ট প্রদর্শনী হিসাবে সংরক্ষিত আছে। ডান কানের তুলির সহজ মাধুর্যের তুলনা ছিল না। তাঁর প্রতিটি ছবিতেই তিনি অনবদ্য পরিকল্পনা, কারুকায ও রঙের ঐশ্বর্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আলোচ্য চিত্রখানিতে তাঁর এই সমস্ত সহজাত গুণেরই পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয়। দৃশ্য-সংস্থাপনার স্বকীয়তায় ও জীবনধর্মীতার গুণে ছবিখানি অন্য দুটি ছবির থেকে কিছু স্বতন্ত্র।

স্যার অগাস্টাস ওয়াল ক্যালকট এই একই দৃশ্যকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত দৃশ্য-শিল্পী। প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য ও আলোছায়ার খেলা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। তাঁর এই ছবিখানির উন্মুক্ততা ও বর্ণবিন্যাসের উজ্জ্বলতা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মানসচক্ষে তিনি দৃশ্যটিকে গ্রীষ্মের কোন এক রৌদ্রালোকিত দ্বিপ্রহরে, ষোড়শ শতকের বিরলবসতি ইংলণ্ডের এক

সুরম্য অট্টালিকার বহিঃপ্রাঙ্গণে ঘটতে দেখেছিলেন। কল্পনার সার্থক রূপায়ণে ছবিখানির মুক্ত-সৌন্দর্য এক আকর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। মিস পেজের চটুল ভঙ্গিতে তাঁর মনের দুরভিসন্ধিরই আভাস ফুটে উঠছে। গ্রীষ্মের এই মধ্যাহ্নে তিনি স্লেণ্ডারকে এক কৌতুকাবহ ঘটনার শিকার করতে চান। স্লেণ্ডার এদিকে অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্তভাবে হাতের ছড়ি দিয়ে মাটি কাটছেন। ওয়ালকট ছবিটির মধ্যে এক অপূর্ব নাটকীয় সম্ভাবনাকে স্তব্ধ করে রেখেছেন। সমগ্র মুহূর্তটি যেন একটি নিটোল মুক্তোর মত টলটল করছে।

এজ ইউ লাইক ইট নাটকটির সৌন্দর্য, সাহিত্যিক, কবি, সমালোচক কাকে না মুগ্ধ করেছে। শিল্পীজগৎও এই প্যাস্টোরাল কমেডিতে সুমহান চিত্রসম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছিলেন। সপ্তদশ শতকের রেনেশাঁস ইংলণ্ডের একটি বিরাট পটভূমিকায় শেক্সপীয়র তাঁর এই নাটকটিকে স্থাপন করেছিলেন।

এই নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে জ্যাক আর্ডেনের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণকারী রাজ্যচ্যুত ডিউকের কাছে জীবন রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা মানুষের সাতটি অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন :

অল দি ওয়ার্ল্ড'স এ স্টেজ
এণ্ড অল দি মেন এণ্ড ওমেন
মিয়ারলি প্লেয়ার্স

....

এট ফার্স্ট দি ইনফাণ্ট
লাস্ট সিন অফ অল......দ্যাট এণ্ডস
ইন সেকেণ্ড চাইল্ডিশনেশ এণ্ড
মিয়ার ওবলিভিয়ান
সানসটিথ, সানসআইজ, সানসটোস্ট,
সানস এভরিথিং।

মানুষের জীবনের এই অনিবার্য পরিণতির রূপ য-শিল্পী প্রথম তুলে ধরলেন, তাঁর নাম টমাস স্টটহার্ড। বয়ডেল শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম

সার্থক শিল্পী স্টটহার্ডকে টার্ণার 'দি গিয়োত্তো অফ ইংল্যাণ্ড' নামে অভিহিত করেছিলেন। সারাজীবনে স্টটহার্ড প্রায় পাঁচ হাজার ছবি এঁকেছিলেন, বেশীর ভাগই শেক্সপীয়রের নাটকের দৃশ্য অবলম্বনে। তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শেক্সপীয়র-শিল্পী। তাঁর সমস্ত ছবিই কল্পনা, উদ্ভাবনশক্তি ও লালিত্যের স্পর্শে রসোত্তীর্ণ। তাঁর 'সেভেন এজেস' ছবিখানির অনাবিল সৌন্দর্য ও ভাবের গাম্ভীর্য আমাদের গিয়োত্তোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শেক্সপীয়র বার্ধক্যের যে-ছবি এঁকেছিলেন, স্টটহার্ডের তুলিতে মানুষের সেই অসহায় পরিণতি মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

উইলিয়াম মালরেডি শেক্সপীয়র-বর্ণিত মানুষের এই সাতটি অবস্থার চিত্র একসঙ্গে ফুটিয়ে তুলছিলেন। মালরেডি বোধহয় চিত্রজগতের দূরদিগন্তে প্রি-র‍্যাফাইলাইট আবির্ভাবের সূচনা দেখতে পেয়েছিলেন, তাই ১৮৩৭ সালে আঁকা এই চিত্রে তাঁকে প্রি-র‍্যাফাই-লাইট আঙ্গিকের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। ছবিটির পরিকল্পনায় তিনি অসাধারণ মৌলিকতা ও সার্থক চিত্ররীতির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। জ্যাকের দীর্ঘ দার্শনিকতা যেন এককথায় আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ইংলণ্ডের কাব্য-জগতে এক বিচিত্র চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই বিচিত্র মানুষটির নাম—উইলিয়াম ব্লেক। সমসাময়িক কাল ব্লেককে কবি হিসাবে না চিনলেও, চিত্রকর হিসাবে তাঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। ব্লেক ছিলেন খাঁটি স্যুররিয়ালিস্ট। কেমন করে যেন তাঁর ধারণা হয়েছিল, স্বপ্নরাজ্যই সত্য—দৃশ্য-জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা। স্বপ্নরাজ্যবিহারী ব্লেকের পাঠ্যসঙ্গী ছিল শেক্সপীয়র, মিল্টন ও বাইবেল। ব্লেক তাঁর দর্শন ও কবি-দৃষ্টির সমন্বয়ে শেক্সপীয়রের অলৌকিক ও অবাস্তব জগৎকে চিত্রে রূপায়িত করার দুঃসাহসী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। শেক্সপীয়র যে-জগৎ শুধু চিন্তাশীল, কল্পনাপ্রবণ পাঠকদের জন্যে সৃষ্টি করেছিলেন, ব্লেক সেই জগতের ঘটনাকেই তাঁর স্যুররিয়ালিস্ট ভাবনার আলোকে এমন সুন্দর

রূপায়িত করেছেন, যার তুলনা শিল্পের ইতিহাসে বিরল। এ মিড-সামার নাইটস ড্রিমের চন্দ্রালোকিত রাতের স্বপন-রাজ্যই ব্লেকের ছবির বিষয়বস্তু। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের ওবেরন, টিশানিয়া, পাক এবং পরীদের নৃত্য তাঁর চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

স্যার জোশেফ নোয়েল প্যাটনও এই একই দৃশ্য অবলম্বনে চিত্র রচনা করেছেন। তিনি ছবিখানির নাম রেখেছিলেন—দি রেকনসিলিয়েশান অফ ওবেরন এণ্ড টিশানিয়া। প্যাটনকে বলা হয়—মেণ্ডেলঝন অফ পেইনটিং'। তাঁর ছবিখানি থেকে যেন এক অশ্রু-পূর্ণ সুর ঝরে পড়ছে। টিশানিয়া যে-সংগীতকে আহ্বান জানিয়েছিলেন—'মিউজিক, হো! মিউজিক সাচ এজ চার্মেথ স্লিপ,' সেই সংগীতেরই রেশ যেন ছবিটির অঙ্গ ঘিরে বিরাজ করছে। তাঁর এই গীতিময় রোমান্টিকতার সঙ্গে একমাত্র মেণ্ডেলঝনের সংগীতেরই তুলনা চলে।

গোধূলির ম্লান আলোয় ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কো পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে আসছেন--বিরাট উন্মুক্ত প্রান্তরে নেমে আসছে রহস্যময় অন্ধকার। হঠাৎ ব্যাঙ্কো চমকে উঠলেন—'হোয়াট আর দিজ সো উইদারড্, এণ্ড সো ওয়াইল্ড ইন দেয়ার এটায়ার', ঝোপ ও আগাছার জঙ্গল থেকে উঠে আসছে তিন বীভৎস মূর্তি। ম্যাকবেথ বল্লেন, 'স্পিক, ইফ ইউ ক্যান, হোয়াট আর ইউ ?' তখন সেই মূর্তির একজন স্বাগত জানাল—'অল হেল ম্যাকবেথ। হেল টু দি, থেন অফ গ্লেমিস!' উনবিংশ শতাব্দীর শক্তিশালী ফরাসী শিল্পী জাঁ বাপতিস্ত কেমিলে কোরতের চিত্রের বিষয়বস্তু ম্যাকবেথ নাটকের এই রহস্যঘন-মুহূর্ত। ওয়ালেশ কালেকশানে রক্ষিত তাঁর 'ম্যাকবেথ এণ্ড দি উইচেস' চিত্রকল্পনার এক অসাধারণ নিদর্শন। কোরত ছিলেন প্রকৃতির শিল্পী। মধ্যদিনের চড়া আলো তিনি পছন্দ করতেন না। সকাল ও সন্ধ্যায় পৃথিবীর বুক জুড়ে যখন আলোছায়ার রহস্য নামত—'হোয়েন অল নেচার সিঙ্গস ইন টিউন', সেই মুহূর্তে তিনি রঙ ও তুলি নিয়ে বসতেন। প্রকৃতির এই আবছা, তন্দ্রাচ্ছন্ন, নিঝুম ভাবটি তাঁর চিত্রে যত সার্থকভাবে রূপায়িত হতে দেখা যায়, অন্য কোন শিল্পীর

চিত্রে তা অনুপস্থিত। ভেরমিয়ারের অঙ্কন-রীতি ও নিজস্ব প্রতিভার সংমিশ্রণে তিনি শেক্সপীয়রের কল্পনাকে যথার্থ রূপায়িত করেছেন। ওয়াল্টার প্যাটার এই ছবিখানি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন: দি ফর্ম এণ্ড ম্যাটার প্রেজেন্ট ওয়ান সিংগল এফেক্ট টু দি ইমাজিনেটিভ রিজন।

জর্জ ক্যাটারমোল ম্যাকবেথ নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য অবলম্বনে ছবি এঁকেছিলেন। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য অবলম্বনে রচিত—'ম্যাকবেথ ইনস্ট্রাক্টিং দি মাডারার্স' এক অনবদ্য সৃষ্টি। চিত্রে প্রতিটি চরিত্রের মনস্তত্ত্ব যথাযথ ফুটে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের অন্যতম প্রখ্যাত আমেরিকান শিল্পী জন সিঙ্গার সার্জেন্ট, লেডি ম্যাকবেথের যে-ছবি এঁকেছিলেন, শিল্পের ইতিহাসে তা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে স্বীকৃত। সার্জেন্টকে বলা হয়—'হাস্টলার' ইন পেন্ট। জীবন্ত প্রতিকৃতি অঙ্কনে তাঁর তুল্য শিল্পী ইতিহাসে বিরল। তিনি যেন তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলির মনের ভাব টেনে বের করে আনতেন। মিঃ ডুলি সার্জেন্ট সম্বন্ধে এক চমৎকার উক্তি করেছেন: স্ট্যাণ্ড দেয়ার' হি সেজ 'হোয়াইল আই টিয়ার দি আগলি ব্লাক হার্ট আউট এভ ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে সেই সময় লেডি ম্যাকবেথরূপী অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুন্দরী অভিনেত্রী মিস এলেন টেরী রাতের পর রাত অমর নাট্যকারের এই অসাধারণ চরিত্রটি জীবন্ত করে তুলছিলেন। সার্জেন্ট জানতেন—দেহপট সনে নট সকলি হারায়। গতিশীল তুলির টানে এলেন টেরীর লেডি ম্যাকবেথকে তিনি কালের দরবারে অমর করে রেখে গেলেন। মনস্তাত্ত্বিক শিল্পী লেডি ম্যাক-বেথের অন্তলোকের লালসা, সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেডি ম্যাকবেথ দুহাতে মাথার উপর মুকুটটি তুলে ধরে বলেছেন:

আনসেক্স মি হিয়ার, এণ্ড ফিল মি
ফ্রম দি ক্রাউন টু দি টো
টপ ফুল অফ ডায়ারেস্ট ক্রুয়েলটি

ছবিটির অপরিসীম সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব তুলনাহীন।

বিতর্কমূলক নাটক হ্যামলেট বহু প্রতিভাবান শিল্পীকে প্রভাবিত

করেছিল। ড্যানিয়েল ম্যাকলিস, হ্যামলেটের 'প্লে সিন' অবলম্বনে একটি সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন। শেক্সপীয়রের বিষয়বস্তু অবলম্বনে অঙ্কিত ছবিগুলির মধ্যে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। দৃশ্যসজ্জায় ম্যাকলিস ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। সাহিত্যধর্মী চিত্রাঙ্কনের যুগে ছবিটি একটি মহৎ সৃষ্টি হিসাবে প্রশংসা অর্জন করেছিল। এই ছবির জন্যেই ম্যাকলিস ইতিহাসে অমর হয়ে থাকলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের চিত্রজগতে এক পরিবর্তনের ঢেউ এসেছিল। গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে শিল্প সৃষ্টিতে নতুন ধারায় প্রবর্তনার জন্যে একদল বিদ্রোহী শিল্পী ক্লাসিকাল পদ্ধতি ছেড়ে রোমান্টিকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে দান্তে, শেক্সপীয়র গেটে, বায়রণ স্কটের সাহিত্য এক নতুন আবেদন নিয়ে ধরা দিয়েছিল। তাঁদের একমাত্র কথাই ছিল: 'হু উইল ডেলিভার আস ফ্রম দি গ্রীকস এণ্ড রোমানস?'

ইউজিন দেলাক্রয় ছিলেন এই নতুন ভাবধারার শিল্পী। তাঁর চিত্রের কাব্যিক গুণ ও অলংকরণের ঐশ্বর্য সর্বকালের শিল্পীর ঈর্ষার বস্তু। তিনি ছিলেন রঙের শিল্পীর। তাঁর বর্ণবিন্যাস ছিল অসাধারণ, অতুলনীয় ও অর্থপূর্ণ। এই নিঃসঙ্গ মানুষটির জীবন ছিল বিচিত্র। সারাদিন দান্তে, শেক্সপীয়র ও বায়রনের সাহিত্যে মগ্ন থাকতেন। হ্যামলেট, ফস্ট ও রোমিও ছিলেন তাঁর প্রিয় চরিত্র। তাঁর বিষাদক্লিষ্ট চরিত্রের সঙ্গে কোথায় যেন হ্যামলেটের চরিত্রের মিল ছিল। ১৮২১ সালের এক স্বকৃত প্রতিকৃতিতে তিনি নিজেকে প্রিন্স হ্যামলেটের কালো পোশাকে উপস্থিত করেছেন। তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন: এজ ইট ইজ মাই ইমাজিনেশান ছ্যাট পিপলস্ মাই সলিচিউড, আই চুজ মাই কম্পেনি'। হ্যামলেটেই ছিলেন তাঁর সঙ্গী। হ্যামলেটের বহু দৃশ্য তিনি এঁকেছিলেন। সবকখানি চিত্রেই তিনি অন্তর্দৃষ্টি ও তন্ময়তার পরিচয় রেখেছেন।

দেলাক্রয় যখন পারিতে তাঁর নিঃসঙ্গ স্টুডিওর অন্তরালে বসে শেক্সপীয়র, দান্তে ও বায়রণ থেকে একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন

সেই সময় ফোর্ড ম্যাডক্স ব্রাউন সেখানে ছিলেন। দেলাক্রয়ের জীবন ও শিল্প তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। ব্রাউন নিজে ছিলেন বিদ্রোহী শিল্পী। তাঁকে ঘিরে রসেটি হান্ট, মিলে প্রমুখ প্রি-র‍্যাফাইলাইট ভ্রাতৃ সংঘের বিদ্রোহী শিল্পীগোষ্ঠী চিত্রকলায় আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন! রসেটি ছিলেন এই প্রাণ-গঙ্গার ভাগীরথ। ব্রাউন, কিং লিয়ারের বিষয়বস্তু অবলম্বনে প্রি-র‍্যাফাইলাইটদের মুখপত্র জার্মের জন্যে বেলাটি রেখাচিত্র এঁকেছিলেন। এই ছবিগুলির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে হেনরি অভিং সমস্ত ছবিগুলিই কিনে নিয়েছিলেন। এই রেখা-চিত্রগুলির কয়েকটি পরবর্তীকালে ব্রাউন চিত্রায়িত করেছিলেন। ১৮৪৮-৪৯ সালে অঙ্কিত লিয়ার এণ্ড কর্ডেলিয়া চিত্রটিকে তিনি বিশিষ্ট সৃষ্টি বলে মনে করতেন। কিং লিয়ার যে মুহূর্তে কর্ডেলিয়াকে পরি-ত্যাগ করছেন এবং ফ্রান্স কর্ডেলিয়াকে বলছেন—

"ফেয়ারেস্ট কর্ডেলিয়া দাউ আর্ট
মোস্ট রিচ বিয়িং পুওর
মোস্ট চয়েস, ফোরসেকেন, এণ্ড
মোস্ট লাভড্ ডেসপাইসড।"

—ব্রাউন তাঁর এক অনবদ্য চিত্রে সেই মুহূর্তটিকে রূপায়িত করেছেন।

ব্রাউন কিছুকাল রসেটির গুরু ছিলেন। ব্রাউনের কিং লিয়ার পর্যায়ের ছবিগুলি রসেটিকে আকৃষ্ট করেছিল। রসেটির কাব্যিক সত্ত্বা রাফাইলের পূর্ববর্তী শিল্পীদের শুদ্ধসত্ব, শুচিস্নিগ্ধ ভাবের অনুগামী ছিল। কিটসের প্রকৃতিপ্রেম, দান্তের ধ্রুপদী মেজাজ ও শেক্সপীয়রীয় সাহিত্যের উজ্জ্বল পরিসরে তাঁর শিল্পীমন সঞ্জীবিত ও বিধৃত হয়েছিল। রসেটি ছিলেন প্রি-রাভাইলাইট আন্দোলনের নেতা। প্রি-রাফাই-লাইটদের মানসলোকের উপর নাট্য-সম্রাট শেক্সপীয়র প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিশেষত হ্যামলেট নাটকখানির বিতর্কমূলক ও বিশুদ্ধ দার্শনিকতার আবেদনই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক।

রসেটি হ্যামলেট নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য অবলম্বনে এক-

খানি ছবি এঁকেছিলেন—'হ্যামলেট এণ্ড ওফেলিয়া'। হ্যামলেটর মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব এই ছবিটিতে এত সার্থকভাবে ফুটেছে যার তুলনা হয় না। হ্যামলেটের মত চরিত্রকে চিত্রে ফুটিয়ে তোলা যে কত শক্ত, তা উল্লেখের প্রয়োজন রাখে না। রসেটির এই ছবিখানি এক অনবদ্য সৃষ্টি।

প্রি-রাফাইলাইট শিল্পী-গোষ্ঠীর অন্যতম শক্তিশালী ও তরুণ শিল্পী জন এভারেট মিলে ওফেলিয়ার মৃত্যু-দৃশ্যটিকে চিত্রে রূপায়িত করেছিলেন। স্বচ্ছ, টলটলে জলে ওফেলিয়ার সুন্দর দেহটি আকণ্ঠ নিমজ্জিত, মুখখানি জেগে আছে উর্দ্ধমুখী। গলায় দুলছে ফুলের মালা, অভিসারিকার সাজে সেজে ওফেলিয়া চলে গেছে তার অনন্ত অভিসারে। ফুলে ঢাকা তার দেহ। চারিদিকের কুঞ্জবীথি ফুলে, ফলে ছেয়ে গেছে। একটি উইলোর ডাল অবনত হয়ে ওফেলিয়ার মাথা স্পর্শ করছে। শেক্সপীয়রের অমর কবি-কল্পনার সার্থক কাব্যিক রূপায়ণ:

There is a willow grows aslant a brook
That shows his hoar leaves in the glassy stream
Their with fantastic garlands did she come
Of crow flowers, nettles daisies and longpurples

... ...

Her clothes spread wide
And mermaid like, awhile they bore her up

... ...

Till that her garments, heavy with their drinks
Pulled the poor wretch from her melodies lay to muddy death,

ছবিখানির উপযুক্ত বহির্দৃশ্য সংগৃহীত হয়েছিল সারবিটানের কাছে টেমস নদীর বদ্ধ জলা অংশ থেকে। মিলে ও হান্টি খুঁজে বের করেছিলেন জায়গাটি। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শেক্সপীয়রের বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গিয়েছিল। ওফেলিয়ার মডেল হয়েছিলেন

মিস এলিনর সিডাল—যিনি পরে রসেটির স্ত্রী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সিডাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা মিলের স্টুডিওতে বাথটাবে আকণ্ঠ জলের তলায় শুয়ে থাকতেন। শিল্পী একদিন জল গরম করে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। সিডাল সেদিন ঠাণ্ডা জলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবগাহন করে রইলেন। সেদিনের সেই অত্যাচারের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল এবং তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সিডালের মৃত্যু রসেটির জীবনে দারুণ আঘাত এনেছিল। তীব্র মাদক-দ্রব্য সেবন ও নানাবিধ অত্যাচারের শোকসন্তপ্ত রসেটিও অকালে ঝরে গিয়েছিলেন। মিলের এই ছবিখানির সঙ্গে ইতিহাসের এক চরম ট্রাজেডির স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। শেক্সপীয়র ওফেলিয়ার ছবির মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী শিল্পীগোষ্টীর কাছ থেকে শেক্সপীয়র প্রীতির চরম মূল্য আদায় করে নিয়েছিলেন।

প্রি-রাফাইলাইট গোষ্ঠির অন্যতম নিষ্ঠাবান, বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্প হোলম্যান হাণ্ট শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কয়েকখানি ছবি এঁকেছিলেন। মেজার ফর মেজারের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ইসাবেলা ক্লাডিয়াসকে বলেছেন :—

> "ও, ওয়্যার ইট বাট মাই লাইফ
> আই উড থ্রো ইট ডাউন—
> ফর ইওর ডেলিভারেন্স
> এজ ফ্রাঙ্কলি এজ এ পিন।"

হাণ্ট, ইসাবেলা ও ক্লডিয়াসকে এই বিশেষ মুহূর্তে তাঁর চিত্রে ধরে রেখেছেন। 'টু জেণ্টলমেন অফ ভেরোনা'র শেষ দৃশ্যে ভ্যালেন্টিন যেখানে বলছেন : কাম, কাম, এ হাণ্ড ফট আইদার, সেই দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণ প্রি-রাফাইলাইট আদর্শে হাণ্ট রূপায়িত করেছেন। সিলভিয়ার মডেল হিসাবে তিনি সিডালকে ব্যবহার করেছিলেন। বহিদৃশ্য এঁকে-ছিলেন কেণ্টের নোয়েল নামক স্থানে অবস্থিত লর্ড এমহার্স্টের সুরম্য উদ্যানে।

দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরে বহু খ্যাতিমান শিল্পী শেক্সপীয়র থেকে তাঁদের

চিত্রের বিষয়বস্তু ও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। এঁরা সকলেই হয়ত লক্ষ্যভেদ করেছিলেন, কিন্তু 'বুলস আই' খুব কম শিল্পীরই সৌভাগ্যে ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর বুকে ধ্বংসের তাণ্ডবস্বাক্ষর রেখে চলে যাবার পর, সাহিত্য ও চিত্রকলায় নতুন চিন্তা ও নতুন আঙ্গিকের পদধ্বনি শোনা গেছে। শিল্পে কিউবিজম, ইম্প্রেসানিজম, ফিউচারিজম, ভার্টিসিজম, পোস্ট-ইম্প্রেসানিজম, মর্ডানিজম, প্রমুখ বিভিন্ন ইজম-এর সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু শেক্সপীয়রের সৃষ্টির পরিধি এত বিশাল ঐশ্বর্য এতই বিপুল যে যুগ যুগ ধরে তিনি সকল মতবাদের শিল্পীরই চাহিদা মেটাতে পারবেন। তাঁর সৃষ্টি-গঙ্গার সব ঘাট থেকেই ঘট ভর নিতে বাধা নেই। একই দৃশ্যকে তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে, বিভিন্ন আঙ্গিকের মাধ্যমে যুগের দরবারে উপস্থাপিত করে নিজেদের ধন্য মানবেন! তবে সেই ১৭৮৯ সালের এক সন্ধ্যার পলমনে, বয়ডেল শেক্সপীয়র গেলারির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অল্ডারম্যান জন বয়ডেল যে-কথা বলেছিলেন, তা সর্বকালের প্রণিধানযোগ্য :

"that it should always be remembered that our great dramatic Bard possessed powers which no pencil can reach : for such was the force of his creative imagination that though he frequently goes beyond Nature, he still continues to be natural, and seems only to do that which Nature would have done had she overstepped her usual limits. It must not then be expected that art of the painter can ever equal the sublimity of our poet. The strength of Michael Angello united to the grace of Raphael would have laboured in vain—for what pencil can give to his airy beings a local habitation and a name ?"

———